আমেরিকায় জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি

ড. নূরুন নবী

১৯৭৫ এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ-বিরোধী শক্তি। বাংলাদেশকে একটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে তাদের অনেককেই সরকারের মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের সাংসদ নির্বাচিত করা হয়। এমতাবস্থায় ১৯৯২ এ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবীতে প্রবল আন্দোলন দানা বাঁধে। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ৭১এর মুক্তিযুদ্ধে এক ছেলে ও স্বামীকে হারিয়েছেন। এ শোক কাটিয়ে না উঠতেই মরণব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত হন। অসুস্থ শরীর নিয়েই আন্দোলনের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। এদিকে ক্যান্সার গোপনে গোপনে তার শরীরে বিস্তারলাভ করতে থাকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৯৯৪ এর এপ্রিলে তিনি বাধ্য হয়েই চিকিৎসার জন্যে আমেরিকায় আসেন। ভর্তি হন ডেট্রোয়েট এর সাইনাই হাসপাতালে। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা নিরিক্ষা করে তার জীবনের আশা ছেড়ে দেন। চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। শুধু শেষ নিশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষা।

লেখক একজন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা, তার অন্তরে বাহিরে বাংলাদেশ। জাহানারা ইমামের আন্দোলনে আমেরিকায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। সে সুবাদে জাহানারা ইমামের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। জাহানারা ইমাম একাধিকবার লেখকের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। লেখকের সুযোগ হয়েছিল জাহানারা ইমামকে একজন মা, আদর্শবান মানুষ, আপোষহীন নেত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্যে নিবেদিত আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি হিসেবে খুব কাছে থেকে জানার।

সর্বোপরি একজন ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী কিভাবে তাঁর শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও দেশের জন্যে দেশে-বিদেশে সংগ্রাম করেছেন তা নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন লেখক। মৃত্যু শয্যায় জাহানারা ইমাম লেখকের বিচলিত মুখ দেখে কি বলেছিলেন, কি কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে, এসব কথা লেখা আছে এ গ্রন্থে।

লেখকের একান্ত আশা, এ গ্রন্থের পাঠক শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মতো একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অসাধারণ গুণাবলী জেনে দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হবার অনুপ্রেরণা পাবেন।

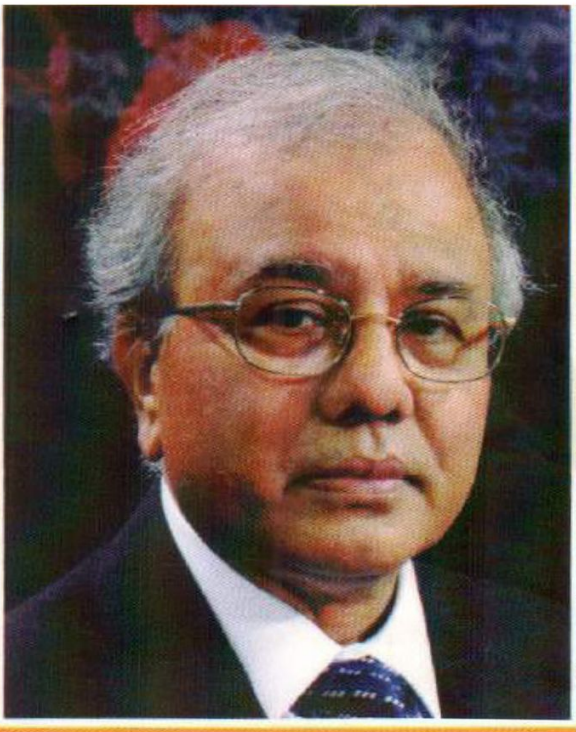

ড. নূরুন নবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণরসায়ন বিষয়ে বিএসসি (অনার্স) এবং এমএসসি, জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, ক্যিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টোরাল। ৭০ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রথম সিনেটের সদস্য। ১৯৮০ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস। পেশায় গবেষক-বিজ্ঞানী, বর্তমানে একটি বহুজাতিক কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছেন। ড. নূরুন নবীর পেটেন্টকৃত আবিষ্কারের বর্তমান সংখ্যা ৫৫। বিজ্ঞানের পেশাদারী জার্নালে এ যাবৎ তাঁর ৫০টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ফজলুল হক হল শাখার সভাপতি, ১৯৬৭-৭১ মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলিতে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রকর্মী, ১৯৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি, টাঙ্গাইলের বাঘা সিদ্দিকীর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা, ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ বর্ণিত টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীর 'ব্রেইন', মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য প্রধান সেনাপতি কর্তৃক প্রদত্ত স্পেশাল সাইটেশন প্রাপ্ত। ৮০-র দশকে

অপর ক্ল্যাপে দেখুন ▸

আমেরিকায় ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রাটিক বাংলাদেশ এবং ৯০-র দশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠায় ও নেতৃত্বে প্রধান ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু পরিষদ আমেরিকা শাখার প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক এবং বর্তমান সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির পৃষ্ঠপোষক, ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা 'ফোবনা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতি, ইউ এস এ কমিটি ফর সেকুলার এ্যান্ড ডেমোক্রটিক বাংলাদেশ এর সভাপতি, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক প্রবাসীর প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদক।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা বই *বিশ বছর পর*-এর প্রকাশক। লেখকের প্রকাশিত বই *জন্মেছি এ বাংলায়*, *আমার একাত্তর আমার যুদ্ধ*, *Born in Bengal* এবং *Bullets of '71–A Freedom Fighter's Story* পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

বর্তমানে তিনি নিউ জার্সি অঙ্গ রাজ্যের প্লেইনসবোরো শহরের কাউনসিলম্যান। ড. নবীর স্ত্রী ড. জিনাত নবী ও বিজ্ঞানী, দুই পুত্র মুসফিক নবী এবং আদনান নবী। নবী-পরিবার বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

আমেরিকায় জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি

ড. নূরুন নবী

সময় প্রকাশন

আমেরিকায় জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি
ড. নূরুন নবী
© লেখক

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫

সময়

সময় ১০৫৭

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/এ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

AMERIKAY JAHANARA IMAMER SHESH DINGULI (Last Days of Jahanara Imam of America) a memoirin by Dr. Nuran Nabi. First Published : February Bookfair 2015 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Baglabazar, Dhaka.
Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 300.00 Only

ISBN 978-984-91543-3-4 Code : 1057

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে : www.rokomari.com, www.boi-mela.com

উ ৎ স র্গ

দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের রূপকার
শহীদ জননী জাহানারা ইমাম-এর
পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূ চি প ত্র

ভূমিকা	৯
প্রথম সাক্ষাৎ	১৩
প্রবাসে বৈশাখ ১৯৯০	১৬
নিউ ইয়র্কে সেমিনার	২১
কবি গুণের জুয়া খেলা	৩৫
'বিশ বছর পর'	৪৭
জাতীয় সমন্বয় কমিটি । যুক্তরাষ্ট্র শাখা	৬২
নিউ ইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ	৭৬
জাহানারা ইমামের চিঠি	৮১
নিউ ইয়র্কে । ১৯৯৩	৮৬
নিউ জার্সিতে ১৯৯৪	১০২
মিশিগানে মৃত্যুসজ্জায়	১১০
শেষ দেখা	১২১
চির বিদায়	১২৬
পরিশিষ্ট –১	১৩৫
পরিশিষ্ট –২	১৩৬

ভূমিকা

১৯৭১ এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত করেছিল পাকিস্তান দখলদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী আলবদর রাজাকাররা। এ-যুদ্ধে তিরিশলক্ষ বাঙ্গালি শহীদ হয়েছিল। হাজার হাজার মা-বোনেরা সম্ভ্রম হারিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের শিমলা চুক্তির আওতায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। অনেকের বিচার সম্পন্ন হয়েছিল। সাজাও পেয়েছিল। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরোধী শক্তি ক্ষমতা দখল করে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত বন্দি এবং সাজা প্রাপ্ত সকল যুদ্ধাপরাধীকে জেল থেকে মুক্ত করে দেয়। বিচারের ট্রাইবুনাল ভেঙ্গে দেয়। যুদ্ধাপরাধীদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা হয়। এমনকি অনেক রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদেরকে সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ (এমপি) নির্বাচিত করা হয়। দেশের সর্বোচ্চ পদে রাষ্ট্রপতির আসনে একজন রাজাকারকে বসানো হয়।

এভাবে বাংলাদেশকে উল্টো পথে চালানো হয়।

রাজাকাররা ভেবেছিল তাদের আর কোনো দিন বিচার হবে না– তাদের ৭১ এর কুকর্মের জন্যে। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেকের মধ্যে হতাশার জন্ম নেয়। তারা আশংকা করে তাদের জীবদ্দশায় রাজাকারদের বিচার হবে না। তারা দেখে যেতে পারবে না রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ।

ইতিহাস অনেক সময় হঠাৎ করেই মোড় নেয়। হঠাৎ করেই অনেক ছোট ঘটনা বড় ঘটনার জন্ম দেয়। বাংলাদেশে তাই হল। ১৯৯১ এর ২৯ ডিসেম্বর ৭১ এর যুদ্ধাপরাধী ঘাতক, পাকিস্তানী পাসপোর্টধারী গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী দলের আমীর নির্বাচিত করা হয়। এটি একটি আইন বিরোধী কাজ। একজন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারে না।

বাঙ্গালি গর্জে উঠল। এ-হতে পারে না। গোলাম আযম সহ সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে প্রথমে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পরে সবাইকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পঠিত

হয়। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলেন এই কমিটির আহ্বায়ক। তাঁর নেতৃত্বে গণআদালতে গোলাম আযমের প্রতীকি বিচারে লক্ষ লক্ষ জনগণের উপস্থিতিতে ২৬ মার্চ ১৯৯২ সোহরওয়ার্দি উদ্যানে গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয়। খালেদা জিয়ার সরকার যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ নিয়ে জাহানারা ইমামসহ সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করে।

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে এই গণআন্দোলনে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। নূতন প্রজন্মের স্বতফূর্ত অংশগ্রহণে এ আন্দোলন এগুতে থাকে। জাতি জাহানারা ইমামকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করে।

জাহানারা ইমাম অনেকদিন ক্যানসারের সাথে বসবাস করছিলেন। আন্দোলনের কঠিন পরিশ্রম এবং সমন্বয় কমিটিতে আভ্যন্তরিণ মত বিরোধ ওনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে।

ক্যান্সার গোপনে গোপনে তাঁর শরীরে বিস্তার করতে থাকে।

তিনি আন্দোলনের শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সমন্বয় কমিটির সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সাথে আমার পরিচয় একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ১৯৮৮ সাল থেকে। কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমামের সাথে যুক্তরাষ্ট্র শাখার যৌথ আহ্বায়ক হিসাবে তার সাথে আমার যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের পুরো সময় মাসে কয়েক বার ফোনে যোগাযোগ রেখেছি।

তিনি প্রতিবছর আমেরিকায় এসেছেন ছেলের কাছে ক্যানসারের চিকিৎসার জন্যে। সে সুযোগে নিউ ইয়র্কে সাংগঠনিক সভার আয়োজন করেছি ওনাকে নিয়ে। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ তে তিনি দুবার আমাদের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। আমাদের সুযোগ হয়েছিল ওনাকে একান্তে পাওয়ার, সেবা করা এবং ওনার মনের কথা জানা।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে একজন মা, একজন আদর্শবান মানুষ, আপোষহীন নেত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্যে আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি হিসাবে খুব কাছ থেকে দেখছি। সর্বোপরি একজন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী কিভাবে তার শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও দেশের জন্যে কাজ করেছেন তা দেখার সুযোগ পেয়েছি।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মত একজন দেশপ্রেমিক মহিয়সী নারীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

খুব কাছ থেকে দেখেছি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম কিভাবে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে দেশের জন্যে সংগ্রাম করেছেন। জেনেছি কি কারণে অভিমান করে তার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন। এ সব কথা লেখা আছে এ-বই-এ। আমার এ বই পড়ে যদি একজন পাঠকও শহীদ জননী জাহানারা ইমামের

মত অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের গুণাবলী জানতে পেরে দেশ প্রেমের অনুপ্রেরণা পায় তাহলে আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

আমার স্ত্রী ড. জিনাত নবী, ফরশাত আলী-এর স্ত্রী ডাঃ শাহানারা আলী এবং সাপ্তাহিক বাঙ্গালি-এর সম্পাদক জনাব কৌশিক আহমেদ এই গ্রন্থটি লিখতে নানা ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। ওনাদের তিনজনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সময় প্রকাশন-এর জনাব ফরিদ আহমেদ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা বোধে আবদ্ধ করেছেন। জনাব ফরিদ আহমেদকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা

ড. নূরুন নবী
নিউ জার্সি, আমেরিকা
www.nurannabi.com

প্রথম সাক্ষাৎ

২ এপ্রিল, ১৯৯৪। সকাল ১০টায় টেলিফোন বেজে উঠলো। তখনো বিছানায় শুয়ে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফোন বেজেই চলেছে। জরুরি কল ভেবে রিসিভার তুললাম। অপর প্রান্তে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর: আমি খালাম্মা বলছি। নবী তুমি কেমন আছো, বকুল কেমন আছে? সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খালাম্মা আপনি কোথা থেকে বলছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি গতকাল মিশিগানে এসেছি। শরীর খুব খারাপ, ক্লান্ত লাগছে। তোমার সাথে খুবই জরুরি রাজনৈতিক আলোচনা আছে। দুপুরের পর অবশ্য কল করবে। এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। টেলিফোন রেখে দিলেন।

আমি বেশ অবাক হলাম। দুশ্চিন্তাও হলো। কী এমন জরুরি রাজনৈতিক আলোচনা? ওনার স্বাস্থ্য কি খুবই খারাপ? অনেক দিন থেকে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত জানি। ক্যান্সার কি তাহলে খালাম্মাকে গ্রাস করতে চাইছে?

অবাক হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ১৯৯২ থেকে তাঁর সাথে আমার নিয়মিত টেলিফোনে কথাবার্তা হতো। বিশেষ করে আগের বছরে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কথা হয়েছে। তিনি যতবার আমেরিকায় এসেছেন, আমাকে জানিয়েছেন। একবার ব্যস্ততার জন্যে আমাকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে জামীকে জানাতে পারেন নি। পরে শুনেছি আমার কাছ থেকে আমেরিকায় আসার খবর পেয়ে জামীর তাঁর মাকে অভিযোগ করেছিলেন। মা, তুমি আমেরিকা আসবে, আর সেটা আমাকে জানতে হবে নবী ভাই-এর কাছ থেকে?

আমি ও আমার স্ত্রী বকুল ১৯৭৫ থেকে বিদেশে। প্রথমে ১৯৮০ পর্যন্ত জাপানে। তারপর থেকে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস। তাই জাহানারা ইমামের খ্যাতির কথা জানতে পারি প্রথমে ১৯৮৭ সালে।

আমার বিশিষ্ট বন্ধু প্রয়াত জননন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ জাহানারা ইমামের বিখ্যাত বই একাত্তরের দিনগুলি এবং কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর লেখা স্বাধীনতা ৭১ বই দুটির সমালোচনা লেখেন সম্ভবত

সাপ্তাহিক বিচিত্রাতে। হুমায়ুন এক ব্যক্তির মাধ্যমে সে লেখাটি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ কাদের সিদ্দিকীর গ্রন্থ সমালোচনাতে আমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন হুমায়ুন। পরে জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি বইটি সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি। জানতে পারি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আত্মত্যাগের কথা। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে এই মহিয়সী মহিলার প্রতি। সুযোগ খুঁজতে থাকি কখন তাঁর দেখা পাবো।

জাহানারা ইমাম শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমির মা। রুমি ৭১ এর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এবং তার বন্ধুরা সীমান্তের ওপারে খেলাঘরে প্রশিক্ষন নিয়েছিলেন ঢাকা শহরে দুর্ধর্ষ গেরিলা অভিযান চালাতে। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর জন্যে ঢাকায় রুমি এবং তার বন্ধুরা ছিল একবিভীষিকাময় ত্রাস। দুঃখের বিষয় আগস্টের ২৯ তারিখে রুমি, তাঁর পিতা শরীফ ইমাম এবং ছোট ভাই জামী সহ বেশ কয়েকজন তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন। রুমিকে অমানষিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তার বাবা ও ছোট ভাইকে অন্যান্য বন্দিদের সাথে পাশবিক নির্যাতন করে। পরে জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমাম ও ছোট ছেলে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলেও তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ছেলে জামীর অল্পবয়সী হওয়ায় কোনোমতে সামাল দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু শরীফ ইমাম নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে বিজয় দিবসের তিন দিন আগে মৃত্যুবরণ করেন। জাহানারা ইমাম তার বিখ্যাত একাত্তরের দিনগুলি বই এর পাতায় পাতায় সেই নয় মাসের বিভীষিকাময় দিনগুলির বিবরণ লিখেছেন। কী যন্ত্রণা নিয়ে সেই নয় মাস তিনি অতিক্রম করেছেন, কী বেদনা স্বামী এবং ছেলে হারানোর তা ফুটে উঠেছে একাত্তরের দিনগুলিতে।

জাহানারা ইমাম তাঁর লেখার জন্যে প্রশংসিত হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশ ও আমেরিকাতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অমায়িক, সুন্দরী ও বিদুষী এই মহিলা প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সকল স্তরের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খুব সম্ভবত তিনি প্রথম মহিলা যিনি ঢাকা শহরে ব্যক্তিগত গাড়ি চালাতেন। এরকম একজন প্রগতিশীল মহিলার সাথে সম্মুখ সাক্ষাৎ-এর অপেক্ষায় ছিলাম।

সে সুযোগ পেলাম ১৯৮৮ এর দ্বিতীয় বাংলাদেশ সম্মেলনে। অনেকটা নাটকীয়ভাবেই। সেবার বাংলাদেশ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি এ সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন। আমি বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউজার্সির সভাপতি হিসেবে সম্মেলনের কো-কনভেনর। স্বাগতিক সংগঠনের সভাপতি ড. ইউসুফ সম্মেলনের আহবায়ক। সম্মেলনে বাংলাদেশে স্বৈরশাসক সেনাপতি এরশাদের বিরুদ্ধে একটি সেমিনারে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি তখন ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর

ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ নামে সংগঠনের আহবায়ক। সেমিনারে সেনাপতি এরশাদের জাতীয় পার্টির। কোনো একজন কেন্দ্রীয় নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার সাথে এক তুমুল বাহাস হলো। তৎকালীন লন্ডন প্রবাসী যায়যায়দিনের সম্পাদক শফিক রেহমানও অংশ নিয়েছিলেন।

সেমিনার শেষে বাইরে লবিতে এসে দেখি সাপ্তাহিক প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে একজন মহিলা। মোহাম্মদউল্লাহ ভাই বললেন, নবী সাহেব ইনি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। আপনি যাকে খুঁজছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে পা ছুঁয়ে সালাম করতে চাইলাম। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, সেমিনারে তোমার বক্তব্য শুনেছি। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা যুদ্ধ করেছিলে, আমার ছেলে ও স্বামী শহীদ হয়েছে। আরো কত ত্যাগ স্বীকার করেছে বাঙালি জাতি। স্বৈরশাসক এরশাদকে হঠাতেই হবে। তোমরা প্রবাস থেকে অনেক কিছু করতে পারো। আমি 'খাল্লামা' সম্বোধন করে বললাম, আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি গত বাংলাদেশ সম্মেলনেও ওয়াশিংটন ডিসিতে রাজনৈতিক সেমিনার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলাম। মোহাম্মদউল্লাহ ভাই সে সেমিনারে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এরশাদের সমর্থকরা হৈচৈ করে আমাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমি নাছোড়বান্দা। সে সম্মেলনের প্রধান অতিথি এরশাদ সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ পরের দিন আসার কথা ছিল। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। হুমকি দিয়েছিলাম বিক্ষোভ করার। গণতন্ত্রের পক্ষে নিউ ইর্য়কে আমাদের কমিটির সদস্যবৃন্দ আমার পক্ষে শ্লোগান দিলে এরশাদ সমর্থকরা চুপসে যায়। একনাগাড়ে বলে থামলাম। জাহানারা ইমাম একটু মুচকি হেসে বললেন, আমি মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের কাছে তোমাদের সেই প্রতিবাদের কথা আগেই শুনেছি। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। কথা শেষ হবার আগেই সেমিনারের রেশ ধরে একটু হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল হলের ভিতরে। সম্মেলনের কনভেনর ড. ইউসুফের ডাকে সেদিকে ছুটে গেলাম। খালাম্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলাম। এভাবেই শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সাথে সেই কাঙ্খিত প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

প্রবাসে বৈশাখ ১৯৯০

জাহানারা ইমামের সাথে আবার দেখা হয় ১৯৯০ সালে। আমরা নিউজার্সি বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু করেছিলাম বেশ কয়েক বছর থেকে। সেবার ১৯ শে মে বর্ষবরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল জয়ন্তি। সব মিলে অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয় প্রবাসে বৈশাখ। আমরা এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম কবি শামসুর রহমানকে। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে আমরা জানতে পারি জাহানারা ইমাম যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। অবস্থান করছেন মিশিগানে তার ছেলে জামীর বাসায়। এ সংবাদ দিয়েছিল তারেক আলী ও মিলিয়া আলী। সে সময় আমাদের সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ড. ফেরদৌস আলী। প্রটোকল অনুসারে ড. আলীকে দিয়ে ফোন করালাম আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে। জাহানারা ইমাম অপারগতা জানালেন। ইতিমধ্যে তাঁর ওয়াশিংটন ডিসি এবং নিউ ইয়র্ক ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ সূচি ঠিক হয়েছে এবং বিমানের টিকিট কেনা হয়েছে। বিশেষ টিকেট হওয়ায় বদলানোর জন্যে বাড়তি দাম দিতে হয়।

আমরা নিরাশ হলাম। আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা বললেন যদি আমি, তারেক আলী এবং মিলিয়া আলী অনুরোধ করি, তা হলে হয়তো তিনি রাজি হবেন। যেহেতু আমরা তিনি জনই তাঁর পূর্ব পরিচিত। তাই আমরা তিন জনেই আলাদাভাবে উনাকে আমাদের প্রবাসে বৈশাখ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোন করলাম। তিনি ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থান করছিলেন। সেই আগের অজুহাতে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করলেন না।

জাহানারা ইমামের সাথে কথা বলে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাশ হলাম না। তিনি বললেন, নবী মন খারাপ কর না। তোমাদের সাথে নিউ ইয়র্কে জুনের ২ তারিখে দেখা হবে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সাপ্তাহিক প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ জাহানারা ইমামকে নিয়ে ম্যানহাটনে একটি সেমিনার করবেন। এটা নিশ্চিত হয়ে আমি তাকে আমার ছেলের আকিকা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানালাম।

আমি বললাম, খালাম্মা, আমাদের ছোট ছেলে আদনানের আকিকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি জুনের তিন তারিখে নিউজার্সিতে। আরও জানালাম সে অনুষ্ঠানে সোসাইটি টু হেলপ এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল- (সেবি) নামের সংগঠনের জন্যে তহবিল সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়াও সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কবি শামসুর রাহমান ও লেখক হায়াৎ মাহমুদ। তিনি সানন্দে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সেবার আমাদের প্রবাসে বৈশাখ অনুষ্ঠানটি খুব সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। সারাদিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালায় ছিল ছোটদের গান, আবৃত্তি ও নাচ। বড়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল রবীন্দ্র নজরুলের উপর গান ও নাচ। ছিল আবৃত্তি অনুষ্ঠান। আলোচনা সভাও জমে উঠেছিল। কবি শামসুর রাহমানের উপস্থিতির জন্যে নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া এমনকি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও নিউ জার্সির অনেক পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি ও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গণমান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, সাপ্তাহিক টিকানার তৎকালীন নির্বাহী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, লেখক ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত এবং ড. পূরবী বসু। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে এসেছিলেন ভয়েস অফ আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী। ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছিলেন ডাঃ জিয়াউদ্দিন সাদেক, সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে এক বিরাট শিল্পী গোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান প্রশংসিত হয়।

প্রধান অতিথি কবি শামসুর রাহমানের বক্তব্য ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জোরালো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখলেন স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বললেন স্পষ্ট ভাষায়। আমাদের মধ্যে কিছু কিছু অরাজনৈতিক ব্যক্তি অবাক হয়েছিলেন রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্যে। আমি খুশী হয়েছিলাম। আমরা যারা প্রবাসে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করছিলাম, তারা এই ভেবে খুশী হয়েছিলাম যে বাংলাদেশের প্রধান কবিও স্বৈরশাসক এরশাদের পতন চান। চান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

আমাদের মধ্যে অনেকে বললেন ড. নবী নিশ্চয়ই কবি শামসুর রাহমানকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন এরশাদ বিরোধী বক্তব্য দেয়ার জন্যে। সে ধারণাটা ছিল মিথ্যা। বক্তব্যের বিষয় নিয়ে কবি শামসুর রাহমান ও আমার মধ্যে কোন আলোচনা হয় নি। কবির বক্তব্য ছিল তার নিজের এবং বিবেকের তাড়নায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর আমি স্টেজের পিছনে গিয়ে কবিকে অভিনন্দন জানাই। উষ্ণ আলিঙ্গন করি। তিনি ভয়ে ভয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন নবী সাহেব, দেশে ফিরতে পারবো তো? আমি অভয় দিয়ে বললাম, আপনি সমস্ত জাতির মনের কথা বলেছেন। সেনাপতি এরশাদ আপনাকে স্পর্শ করার সাহস

পাবে না। তিনি আশ্বস্ত হলেন কিনা বুঝতে পারলাম না।

সাপ্তাহিক প্রবাসী ও সাপ্তাহিক ঠিকানাতে পরের সপ্তাহে কবি শামসুর রাহমানের এরশাদ বিরোধী বক্তব্য ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ অনুষ্ঠানে একটি কুটনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল। কবি শামসুর রহমানের উপস্থিতি জেনে আমেরিকায় বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আবু জাফর অবায়দুল্লাহ খান আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদানের অভিপ্রায় জানিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। রাষ্ট্রদূত অবায়দুল্লাহ খানকে সঙ্গে সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালে, তিনি বললেন, আমি কবি শামসুর রাহমানকে শ্রদ্ধা করি, তিনি আমার বন্ধু। তাই আপনাদের অনুষ্ঠানে আসতে চাই।

উল্লেখ্য রাষ্ট্রদূত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান একজন স্বনামধন্য কবি। তিনি পেশায় ছিলেন একজন দক্ষ আমলা। সরকারের সচিব পদে থেকে অবসর গ্রহণ করে কিছুদিন এরশাদ প্রশাসনের মন্ত্রী ছিলেন। পরে আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে আসেন।

রাষ্ট্রদূত খানের আগমনের খবর আমাদের আয়োজক কমিটির সবাইকে জানালাম। আমরা খুশী, রাষ্ট্রদূত আসবেন। আমাদের অনুষ্ঠানের আর একটি মাত্রা যোগ হবে।

আমি কবিকে বললাম, রাহমান ভাই আপনি জেনে খুশী হবেন, শেষ মুহূর্তে আপনার বন্ধু রাষ্ট্রদূত খান আগামী কাল আমাদের অনুষ্ঠানে আসছেন। আমাকে জানিয়েছেন তার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য– আপনার সাথে সাক্ষাৎ।

কবি শূনে কোন উচ্ছাস প্রকাশ করলেন না। এমনকি কোন মন্তব্য ও করলেন না। এমনিতে কবি মৃদুভাষী এবং চুপচাপ থাকেন। তবুও আমি একটু অবাক হলাম। সেখানে আরও লোক উপস্থিত ছিলেন। ভাবলাম উনি সবার উপস্থিতিতে কিছু বলতে চাইছেন না। আমার ধারণাটা ঠিক। সবাই চলে গেলে তিনি আমাকে বললেন– নবী সাহেব আপনাকে একটু অনুরোধ করব। আশা করি আপনি রাখবেন। কবি খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি ওনার সাথে দেখা করতে চাই না। রাষ্ট্রদূত যদি এসেই যায় তবে আমার সাথে উনাকে বসাবেন না।

আমি কবির কথা শুনে উভয় সংকটে পড়লাম। একদিকে শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথির অভিপ্রায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রদূতের পদ মর্যাদা রক্ষা করা। সাধারণত আয়োজকবৃন্দ সর্বদাই রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতি সম্মানজনক বিষয় মনে করেন। কিভাবে দুকুল রক্ষা করা যায় ভাবছিলাম। যদি রাষ্ট্রদূতের আগমনের কথা প্রকাশ করি সবাই লাফিয়ে উঠবে তাকে মঞ্চে নিয়ে প্রধান অতিথির পাশে বসাতে। তাই বিষয়টি চেপে গেলাম। কবিকে আশ্বস্ত করলাম, তাকে আমরা রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে বিব্রত করব না।

অনুষ্ঠানের দিন রাষ্ট্রদূত এলেন। আমি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম।

এর আগেই আমি মিলনায়তনে প্রথম সারিতে বাম দিকের আসনে কবি শামসুর রাহমানকে বসালাম। তার আশে পাশে প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, তৎকালীন ঠিকানার নির্বাহী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে বসালাম। ডান পাশের প্রথম সারিতে আমি, ড. ফেরদৌস আলী ও সমিতি অন্যসব কর্মকর্তাদেরকে বসালাম। রাষ্ট্রদূত খানকে নিয়ে আমাদের পাশে বসালাম। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে প্রধান অতিথির ভাষণ। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদূত জানিয়ে দিলেন তিনি কোন বক্তব্য দিবেন না। শুধু কবি শামসুর রাহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষ হতেই আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি দিলাম। কবিকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে একটি পূর্বনির্ধারিত টেবিলে আসন গ্রহণ করলাম। আগেই ড. আলীর সাথে আমার কথা হয়েছিল। তিনি রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে আমাদের টেবিলে বসবেন। রাষ্ট্রদূত খানকে আমার ডানে বসালাম। কবি বসেছিলেন আমার বামে। তাঁরা দুজনে মুখোমুখি বসলেন না।

রাষ্ট্রদূত প্রথমেই কবির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। কথোপকথনের চেষ্টা করলেন। কবি সীমিত কথাবার্তা বললেন। সে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। আমার মনে হচ্ছিল সে সাক্ষাৎটি না হলেও ভাল হতো। সামান্য কিছু খেয়ে আমরা আবার মিলনায়তনে প্রবেশ করলাম। আগের নির্ধারিত আসনে বসলাম। একটু পরেই রাষ্ট্রদূত তাড়া আছে বলে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি এবং ড. আলী গাড়ি অবধি গিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানালাম। তিনি ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে নিউজার্সি ত্যাগ করলেন।

আমি অতি কষ্টে উভয় কুল রক্ষা করতে সক্ষম হলাম। তাঁরা দুজনে মঞ্চে পাশাপাশি বসেন নাই। অথচ তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটল খাবার টেবিলে যদিও এক অস্বস্তিকর পরিবেশে।

কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি রাষ্ট্রদূত ওবায়দুল্লাহ খানকে এড়িয়ে গেলেন কেন? কেন এ অনিহা?

কবি শামসুর রাহমান সে সময়ে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এরশাদ সরকার বিরোধী কলাম লিখছেন। দেশে বিদেশে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তিনি এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। সে সময় তাঁর মত অনেক বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকরা প্রতিবাদী হয়েছেন। পক্ষান্তরে কবি শামসুর রহমানের বিশিষ্ট বন্ধু কবি এবং মেধাবী আমলা ওবায়দুল্লাহ স্বৈরশাসকের প্রথমে মন্ত্রী এবং পরে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের চাকুরী নিয়েছেন।

অনেকের মতো কবি শামসুর রহমান তার বন্ধু কবি ওবায়দুল্লাহ খানকে তাদের পাশে আশা করেছিলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ খান বাংলাদেশের মানুষর বিপক্ষে অবস্থান নেন। কবি শামসুর রাহমান মন্তব্য করলেন, ওবায়দুল্লাহ খান

স্বৈরশাসক এরশাদের মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত না হলে কি তার জীবন চলত না? এর উত্তর একমাত্র রাষ্ট্রদূত খানই দিতে পারবেন।

যাই হোক, আমাদের প্রবাসে বৈশাখ অনুষ্ঠানে এ অনাকাংখিত কূটনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বিষয়টি আমি এবং ড. আলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম বলে প্রকাশ্য কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই।

আমাদের এ অনুষ্ঠানের সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ জাহানারা ইমামকে জানালাম। এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে পারায় তিনি আফসোস করলেন। কিন্তু তাঁকে আগামী বছর প্রবাসে বৈশাখ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। যদি তাঁর স্বাস্থ্য ভালো থাকে তবে তিনি অবশ্যই আগামী বছর এ অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। জুনের ২ তারিখে জাহানারা ইমামের সাক্ষাতের অপেক্ষায় রইলাম।

নিউ ইয়র্কে সেমিনার

সাপ্তাহিক প্রবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ২ জুনে একটি সেমিনার আয়োজন করেছিলেন। বিষয় বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত নিউ স্কুলে আধ্যয়নরত কয়েকজন ছাত্র ও সেমিনারের জন্য সেখানকার একটি মিলনায়তন এর ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তা কবি শামসুর রাহমান, লেখক জাহানারা ইমাম এবং লেখক হায়াৎ মাহমুদ।

কবি শামসুর রাহমানকে নিউ জার্সি বাংলাদেশ সমিতি আমাদের প্রবাসে বৈশাখ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে স্পন্সর করে এনেছিলাম। কিন্তু ওনার অনেক ভক্তবৃন্দ আমেরিকাতে আসার পূর্বেই ওনার সাথে যোগাযোগ করে তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ঢাকাতে ওনার সাথে যোগাযোগ শুরু করে। কবি আমাকে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে আমি আমাদের সমিতির সিদ্ধান্ত ওনাকে জানাই যে আমাদের অনুষ্ঠানের আগে তিনি অন্য কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না। আমাদের অনুষ্ঠানের পরে তিনি যে কোন অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন।

আমি সে সময় স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলাম। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অনেককে নিয়ে ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ নামে সংগঠনের নেতৃত্ব আন্দোলন করছিলাম। আমি এ সংগঠনের আহ্বায়ক। এরশাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, সেমিনার এবং লেখালেখি করে আসছিলাম সংগঠনের নেতৃত্বে। আমাদের এ কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, আওয়ামী লীগ নেতা সালাম, ফজলু, তালেব, ফকরুল, গণতন্ত্রী দলের নেতা গজনফর আলী ও ফরাশত আলী এবং আরও অনেকে।

সে সময় কবি শামসুর রাহমান এরশাদ বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। তাই ওনাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক, বোস্টন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে কয়েকটি অনুষ্ঠানের অগ্রিম ব্যবস্থা করে ফেললাম।

সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ উপরোক্ত সেমিনারের প্রস্তাব করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা স্থির হয়ে গেল। কবি শামসুর রহমানের পরে কবি হায়াৎ মাহমুদ নিউ ইয়র্কে আসেন অন্য একটি কাজে। তাকেও অর্ন্তভুক্ত করা হল। তারপর জানতে পারলাম লেখক জাহানারা ইমাম সে সময় নিউইয়র্কে আসবেন। ওনাকে অর্ন্তভুক্ত করা হল।

সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ আমার বন্ধু এবং পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি অনেক ঝুকি নিয়ে আর্থিক সংকট সত্ত্বেও সাপ্তাহিক প্রবাসী পত্রিকাতে এরশাদ বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ আদর্শিক কারণে প্রথমে পরিচয হলেও পরে তা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হয়। আমি প্রথমে প্রবাসী পত্রিকার কট্টর সমর্থক, পরে এর ব্যবস্থাপনায় জড়িত হই। কাজেই কবি শামসুর রহমানকে নিয়ে সাপ্তাহিক প্রবাসী পত্রিকার উদ্যোগকে আমি প্রথমেই স্বাগত জানাই।

এ অনুষ্ঠানে জাহানারা ইমামের অর্ন্তভুক্তিও আদর্শিক কারণে। ওনারা পরস্পরকে বেশ কিছুদিন যাবৎ চেনেন এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জাহানারা ইমাম তাঁর লিখিত প্রবাসের দিনলিপি গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন–

"প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হয় ১৯৮৮ সালে। তিনি সজ্জন ব্যক্তি। মৃদুভাষী এবং পত্রিকার প্রতি নিবেদিত প্রাণ। বাংলাদেশ থেকে লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী যে-ই নিউইয়র্কে যান না কেন, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ তার কাছ থেকে প্রবাসীর জন্যে লেখা আহ্বান করবেনই বাংলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সংকট উত্তরণের জন্যে কি করা উচিৎ প্রবাসী তার কাছ থেকে 'প্রবাসী'র জন্যে লেখা আহ্বান করবেনই। বাংলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সংকট উত্তরণের জন্য কি করা উচিৎ, প্রবাসী বাঙালদিরই বা এ সম্পর্কে কি কর্তব্য সে সব বিষয়ে মোহাম্মদ উল্লাহর উদ্যোগ এবং আগ্রহ প্রচণ্ড। প্রবাসী বাঙালদির মধ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর উদ্যম এবং প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।"

নিউ জার্সি থেকে ২ জুন ম্যানহাটনের সেমিনারে হাজির হলাম। সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সভাপতিত্ব করলেন। জাহানারা ইমাম প্রথমেই বক্তব্য রাখলেন। আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা করলেন। বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামাতে ইসলামের উত্থানের কঠোর সমালোচনা করলেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করছে এবং তা ইতিমধ্যে অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ছে। তিনি সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে অনুরোদ করলেন। স্বৈরশাসনের ছত্রছায়ায় জামাতে ইসলামের উত্থানকে রুখতে সবাইকে আহ্বান জানালেন।

কবি শামসুর রাহমান যথারীতি স্বৈরশাসনের অবসান এবং গণতন্ত্র

পুনঃরুদ্ধানের আহ্বান জানালেন। লেখক হায়াৎ মাহমুদ রাজনৈতিক বক্তব্য এড়িয়ে গিয়ে বাংলা সংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য রক্ষায় জন্যে তাগিদ দিলেন।

অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হলো সেটা হাইজ্যাক হয়ে গেছে। যদিও আয়োজক প্রবাসী পত্রিকা, কিন্তু অনুষ্ঠানের পরিচালনা, স্থানীয় বক্তা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার এসব ব্যাপারে নিউ স্কুলের ছাত্রদের সিদ্ধান্তের প্রতিফলন দেখলম। প্রবাসে চলমান এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সংগঠন ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ এর কোনো উল্লেখ ছিল না, এমনকি অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কবি শামসুর রাহমানকে যারা স্পন্সর করেছেন সেই নিউজার্সি বাংলাদেশ সমিতির নাম উল্লেখ করা হলো না। এ অবহেলার জন্যে সমিতির কর্মকর্তাদের কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

আকিকা

যাই হোক, অনুষ্ঠান শেষে জাহানারা ইমাম, কবি শামসুর রাহমান ও হায়াৎ মাহমুদকে পরের দিন নিউজার্সিতে আমার ছেলের আকিকা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলাম।

৩ জুন আমাদের ছোট ছেলে আদনান নবী এর আকিকা অনুষ্ঠান। প্রিন্সটন শহরের একটি চার্চে এর আয়োজন। প্রায় ১০০ শত পরিবারের প্রায় ৪০০ শত অতিথি আমন্ত্রিত। সে সময় ভাগ্যক্রমে কমি শামসুর রাহমান, জাহানারা ইমাম ও লেখক হায়াৎ মাহমুদ নিউইয়র্কে অবস্থান করছিলেন। ওনাদেরকে সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। ওনারা তিন জনেই আমাদর সে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

আমি এবং আমার স্ত্রী ড. জিনাত নবী সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম এ অনুষ্ঠানে আমরা Society to Help Education in Bangladesh International (সেবী) এর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করব। বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রথা হিসেবে আমন্ত্রিত ১০০ পরিবার নিশ্চয় একটি করে উপহার আমাদের ছেলে আদনানের জন্যে আনবে। কিন্তু একটি শিশুর জন্যে ১০০টি উপহারের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই আমরা সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম উপহারের পরিবর্তে উপহার কেনার সমপরিমাণ অর্থ সেবী-এর নামে চেক দেওয়ার জন্যে। অনুষ্ঠান শেষে দেখলাম সবাই সেবীর নামে চেক দিয়েছেন যা ছিল দেড় হাজার ডলারের উর্দ্ধে। অনেকেই চেক এবং ছেলের জন্যে উপহারও এনেছিলেন। আমাদের দেড় বছরের ছেলে আদনান তাঁর জীবনের শুরু হয়েছিল তার উপলক্ষে এ রকম একটি মহতী কাজ দিয়ে।

অনুষ্ঠানে কবি শামসুর রাহমান, জাহানারা ইমাম ও হায়াৎ মাহমুদ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখলেন। আমাদের ছেলেকে আর্শিবাদ করলেন। সেবীর জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন। এ উদ্যোগকে প্রশংসা করে জাহানারা

ইমাম তাঁর প্রবাসের দিনলিপি গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

"নিউ জার্সিতে Society to Help Education in Bangladesh International, সংক্ষেপে SHEBI নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ডা. নূরুন নবী এর কর্ণধার। বাংলাদেশে গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাখাতে সাহায্য প্রদানের জন্য আমেকিরায় অর্থ সংগ্রহ করা হল সেবী-র প্রধান উদ্দেশ্য। ছয় বছর আগে সেবীর জন্ম। এদের কার্যক্রমের মধ্যে গরিব ছেলেমেয়েদের বৃত্তি প্রদান, বই কেনার অর্থ প্রদান, স্কুলঘর নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান ইত্যাদি। বাংলাদেশের একটি প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রীরা পড়ালেখার খরচ মাসে একশো থেকে তিনশো টাকার বেশি নয়। সেবী এই হিসাবে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক দুই থেকে পাঁচ ডলার বৃত্তি দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যেই সেবী কয়েকটি স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্যে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদান করেছেন। মনে পড়ল গতবছর জুন মাসে তিন তারিখে নিউ জার্সিতে ড. নূরুন নবী ও তাঁর স্ত্রী জিনাত নবী তাঁদের ছেলের আকিকা অনুষ্ঠানে সেবী-র জন্য অর্থসংগ্রহের অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন নিমন্ত্রিত সবাই তো তাঁদের ছেলেকে জামা কাপড়, খেলনা এসবই উপহার দেবেন। একটা বাচ্চার জন্য এত খেলনা, কাপড় জামা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। তার বদলে নিমন্ত্রিতরা সেবী-র তহবিলে অর্থ সাহায্য করুন। এই অনুপম অনুষ্ঠানে ১৫০০ ডলার তহবিল উঠেছিল। বলা বাহুল্য, ছেলেটি কয়েকটা খেলনা উপহার পেয়েছিল যেগুলি তাকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। ওদিন ওখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

অন্য প্রবাসী বাঙালিরা এবং বাংলাদেশে বসবাসকারীরাও তাঁদের সন্তানদের আকিকা, জন্মদিন বা নিজেদের বিবাহবার্ষিকী জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোকেও যেকোন জনহিতকর কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ অনুষ্ঠানে পরিণত করতে পারেন। যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, আশা করি, তাঁরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন।"

আকিকা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তিনজন গুণি ব্যক্তিকে কাছে পেয়ে তাদের ভক্তরা তাদেরকে ঘিরে রাখল ছবি তোলা, অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা এবং গল্প করা নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল। আমি এবং বকুল প্রায় ৪০০ শিশু এবং বড়দেরকে আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকলাম। তিনজন বিশেষ অতিথিদের জন্যে বিশেষ কোন আপায়নের সুযোগ পেলাম না। ওনারা অনুষ্ঠান শেষে নিউ ইয়র্কে ফিরে গেলেন।

পরের দিন জাহানারা ইমামকে ফোন করলাম, ধন্যবাদ জানালাম এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তিনি অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন বিশেষ করে সেবীর জন্যে অর্থ সংগ্রহ উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের আবার প্রশংসা করলেন। তারপর একটু বিলম্ব করে আস্তে আস্তে বললেন– নবী তোমাদেরকে বলি নাই যে আমি তোমাদের অনুষ্ঠানে উপবাস করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি হয়তো রোজা রেখে ছিলেন

যা আমরা খেয়াল করি নাই। তারপরেই বললেন, আমার মুখের ক্যান্সার অপারেশনের পর আমি শক্ত কিছু খেতে পারি না। ঝোল মসলা মোটেই সহ্য করতে পারি না। তাই তোমাদের অনুষ্ঠানে আমি কিছু খেতে পারি নাই। শুধু অনুষ্ঠানের একটু মিষ্টি খেয়েছি। আমি শুনে খুব লজ্জিত ও দুঃখিত হলাম। আমি বারবার ক্ষমা চাইলাম। তিনি আশ্বস্ত করে বললেন, তোমরা আমার ছেলের মত। আমার দুঃখকষ্ঠ তোমাদেরকে না বললে, আর কাকে বলব। ক্যান্সারে জাহানারা ইমামের জীবন কিভাবে বিধ্বস্ত করেছে কিছুটা হলেও বুঝতে পারলাম। বারবার তিনি বললেন, তোমরা এ নিয়ে অপরাধ বোধ করো না। এটাই এখন আমার জীবন। আমি– ক্যান্সারের সাথে বসবাস করতে শিখছি প্রতিনিয়ত।

পরবর্তী সময়ে তিনি ক্যান্সারে সাথে বসবাস নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

জাহানারা ইমাম আরও অভিযোগ করলেন। অনুষ্ঠানে আসার জন্যে আমি আমার এক বন্ধুকে তার ক্যাডিলাক গাড়িতে নিউ ইয়র্কে অবস্থানরত কবি শামসুর রাহমান, কবি হায়াৎ মাহমুদ ও জাহানারা ইমামকে নিউ জার্সিতে আমাদের অনুষ্ঠানে আনার ব্যবস্থা করেছিলাম। এ-তিন অতিথির সঙ্গে এসেছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ও ড. পূরবী বসু।

জাহানারা ইমাম বললেন আমার বন্ধুর গাড়িতে নিউ জার্সি যাতায়াতে তিনি আরও বেশি কষ্ট পেয়েছেন। যদিও ক্যাডিলাক বড় এবং বিলাস বহুল গাড়ি। কিন্তু অন্য সব অতিথিদের নিউ ইয়র্ক শহরের অন্য প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে ওনাকে তার আত্মীয় বেবী এবং মিলনের ব্রুকলীনের বাসা থেকে তুলে নিয়ে নিউ জার্সি আসতে অনেক সময় লেগেছিল। এতলম্বা সময় গাড়িতে বসে থাকতে ওনার খুব কষ্ট হয়েছিল।

ওনার সান্ত্বনা সত্বেও নিজেদের খুব অপরাধী মনে হলো। খালাম্মা বললেন, দেখ তোমাদেরকে আপন জন মনে করি। তাই মনের কথা তোমাদের সাথে ভা। করলাম।

বকুলও আমি ভাবলাম, খালাম্মা খুব সৎ ব্যক্তি। সত্যিই তিনি আমাদেরকে স্নেহ করেন। তা না হলে এই অভিযোগ তিনি অতি অবলীলায় আমাদেরকে বলতে পারতেন না। সেই থেকে খালাম্মা জাহানারা ইমামের সাথে আমাদের মা-সন্তানের মতো সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল।

প্রবাসে বৈশাখ ১৯৯১

জাহানারা ইমাম তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি দুদিন ব্যাপী আমাদের প্রবাসে বৈশাখ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করলেন। যদিও তিনি গত বছরের অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন নি। এবারও গত বছরের মতো সারা দিনব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। কবি নির্মলেন্দু গুণ এসেছিলেন বিশেষ অতিথি

হিসাবে। গত বারের ন্যায় এবারে অনুষ্ঠানমালায় ছিল ছোট বড়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাচ, গান, আবৃত্তি, খণ্ড নাটক, আলোচনা সভা ইত্যাদি। নূতন মাত্রা যোগ হয়েছিল বাংলাদেশের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ। মাত্র কয়েক দিন আগে চিটাগাং সন্দীপ অঞ্চলে সাইক্লোনে প্রচুর জানমালের ক্ষতি হয়েছে। আমরা অনুষ্ঠান বাতিল না করে তা ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের জন্যে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেই। সে মোতাবেক, আজকের দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, কলাম লেখক এবং নূতন প্রজন্মদের অনুকরণীয় ব্যক্তি ড. জাফর ইকবাল তখন আমাদের নিউ জার্সি সমিতির একজন সংগঠক। জাফর সাইক্লোনের জলউচ্ছাসকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে মঞ্চব্যাপী এক বিশাল ব্যানার বানালেন যা চোখে পড়ার মত এবং মন কেড়ে নেওয়ার মত। ব্যানারে দেখা যাচ্ছে জলোচ্ছাসের মধ্যে একজন মা তার ছোট শিশুকে প্রবল স্রোতের হাত হতে রক্ষা করতে প্রাণপন চেষ্টা করছেন।

গত বারের মতো এবারের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হল। জাহানারা ইমাম এবং নির্মলেন্দু গুণ তাঁদের ভক্তদের দ্বারা সারাক্ষণ ঘিরে থাকলেন। গল্প, অটোগ্রাফ, ছবিতোলা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত থাকলাম। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদ্বয়ের সাথে আড্ডা দিতে পারলাম না।

এ অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাঙালি সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ড. পূরবী দত্তসহ আরোও অনেকে এসেছিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে এসেছিলেন ভয়েস অফ আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী। তিনি তাঁর দরাজ গলায় আবৃত্তি করলেন, আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এ আলোচনা সভা আমি পরিচালনা করলাম।

সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক কৌশিক আহমেদ ঠিকানা থেকে পদত্যাগ করে নতুন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সাপ্তাহিকের নাম রেখেছেন সাপ্তাহিক বাঙালী। সৌভাগ্যক্রমে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হবে আমাদের অনুষ্ঠানের পরের সপ্তাহে শুক্রবারে। সে মোতাবেক আমাদের অনুষ্ঠানে বিস্তারিত সংবাদ বেরুল সাপ্তাহিক বাঙালীর প্রথম সংখ্যায়। অনেক ছবি, অনেক সাধুবাদ এবং জাহানারা ইমাম ও কবি নির্মলেন্দু গুণের উপস্থিতি নিয়ে সচিত্র সংবাদ প্রকাশ হলে সাপ্তাহিক বাঙালীর পাতা পাতায়। জাহানারা ইমাম আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি উপভোগ করেছিলেন অনুষ্ঠানের সব কর্মসূচি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর প্রবাসে দিনগুলি গ্রন্থের ৫৫-৫৬ পাতায় এইভাবে–

১৬ মে ১৯৯১

"আগামীকাল নিউ জার্সি রওনা দেব। ওখানে ১৮ মে 'প্রবাসে বৈশাখ' বলে

একটা সারা দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে সেখানে আমি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত। গত বছর এই অনুষ্ঠানটায যেতে পারি নি ঐ সময়ে আমার ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবার প্রোগ্রাম আগে থেকে ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে। এবারে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির কর্মকর্তারা আর কালক্ষেপণ করেন নি। আমি মিশিগান পৌঁছানোর পরপরই ওঁরা আমাকে ফোনে যোগাযোগ করেন। আমিও ওঁদের অনুষ্ঠানের তারিখের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমার নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি ভ্রমণের দিনস্থির করেছি। যখন এসব কথাবার্তা হয়, তখন বাংলাদেশে সাইক্লোন হয় নি। তাই পুরো অনুষ্ঠানটা আনন্দের ব্যাপার হবার কথা ছিল। কিন্তু সাইক্লোন হবার পর দেশের খবর শুনে, পড়ে, দেখে সব প্রবাসী বাঙালির মুখ চুন, মন উদভ্রান্ত, বিচলিত। সবই ত্রাণ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত। নিউ জার্সির বাঙালিরা 'প্রবাসে বৈশাখ' অনুষ্ঠানটিকে অর্থসংগ্রহের অনুষ্ঠানে পরিবর্তিত করে ফেলেছেন। যাঁরা স্টল দেবেন, তাঁরা বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ত্রাণ তহবিলে দেবেন। এমনিতে সবার জন্য উন্মুক্ত যার অনুষ্ঠানে টিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাও ত্রাণ তহবিলের জন্য। আমি ত্রাণ তহবিলে দেবার জন্যে আমার নিজের লেখা আটটি বই সঙ্গে নিয়েছি। ওই বই বিক্রী করে যা হবে, সেটা রিলিফ ফান্ডে যাবে। বিদেশে এর বেশি কিছু করা আমার সাধ্যের অতীত।

আগামীকাল যাব, কিন্তু সুটকেস আজই গুছিয়ে ফেলতে হয়েছে। কারণ আগামীকাল দুপুর ১২টা থেকে দুটো পর্যন্ত হাসপাতালে আমার আলট্রাসাউন্ড এবং ক্যাট-স্ক্যান-এই দুটো পরীক্ষা হবে। বাড়ি থেকে বেরোতে হবে সোয়া এগারোটায়, বাড়ি ফিতে ফিরতে হবে তিনটে। সাড়ে চারটায় এয়ারপোর্ট রওনা দিতে হবে।

খুব বিরক্তি লাগছে। অনেক চেষ্টা করেও এর আগে ঐ পরীক্ষা দুটো করানোর ডেট পাওয়া যায় নি। কোথাও যাবার আগে এত হুজ্জত কি ভালো লাগে? এমনিতেই শরীর ভালো যায় না। আগামীকাল রাত্রে নিউ জার্সি পৌঁছেই, তার পরের দিনই 'প্রবাসে বৈশাখ' অনুষ্ঠান। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। ওরা শেষমুহূর্তে ফোনে জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের উদ্বোধনও আমাকেই করতে হবে।

২০ মে ১৯৯১

গত তিনটে দিন যে, কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেছে, তা তখন টের না পেলেও আজ পাচ্ছি। সারা গায়ে ব্যথা, ঘুমে যেন চোখ জড়িয়ে আছে অথচ ঘুম নেই। অনেক বছর পর শনি রবি দুটো দিন শরীরের কথা মনে না রেখেই উপভোগ করেছি।

১৭ মে রাতে নিউ জার্সি পৌঁছানোর কথা ছিল সোয়া আটটায়, আসলে পৌঁছেছি সোয়া দশটায়। নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য বন্ধ ছিল দু'ঘন্টা। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ জার্সির প্রেসিডেন্ট ড. ফেরদৌস আলী এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন আমাকে আনতে। তাঁর বাসায় পৌঁছুই রাত সোয়া

এগারোটায়। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে উঠে, শুতে শুতে একটা। পরদিনই প্রবাসে বৈশাখ অনুষ্ঠান। সকাল ১১ টা থেকে রাত ১১টা– সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান।

ড. ফেরদৌস আলী বললেন, 'খালাম্মা, অনুষ্ঠান শুরু হতে একটু দেরীই হবে। আপনার অত আগে গিয়ে কাজ নেই। সব কিছু ঠিকঠাক হলে আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।' নিউব্রানসউইক স্কুলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠান। জায়গাটা ফেরদৌস আলী বাড়ি থেকে গাড়িতে ১০ মিনিটের রাস্তা। সেই ভালো। ফেরদৌস আলী ১০ টায় চলে গেলেন। ফেরদৌসের স্ত্রী হেনা একটা খাবারের স্টল দেবেন। তারজন্যে তিনি চারশো সিঙ্গাড়া ভেজেছেন। গতকাল থেকেই সিঙ্গাড়া বানানো ও ভাজা চলেছে। গতকাল যখন এ বাসায় এসে পৌঁছই তখন দেখি হেনা আমার তাঁর একবান্ধবী, দু'জনে মিলে সিঙ্গাড়া ভাজছেন। হেনা বললেন, তিনিও আর সঙ্গেই যাবেন। কারণ সব জিনিসপত্র গুছিয়ে, নিজে তৈরি হয়ে নিতে সময় লাগবে। স্টলের জন্য খাবার-দাবার তৈরি ছাড়াও আরো অনেক কাজ হেনার হাতে এসে জমেছে। তাঁর মেয়ে অনুষ্ঠানে নাচবে, তার নাচের পোশাক এখনো রেডি হয় নি। সেটা করতে হবে। তাছাড়াও আরো বহু টুকিটাকি। এসোসিয়েশনের সবাই কাজে ব্যস্ত। গতকাল এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় আসার পথে ফেরদৌস আলী বলছিলেন, বাসায় আসার পথে ফেরদৌস আলী বলছিলেন, শাহাব সিদ্দিকী, মাহমুদা ইরানী, জাফর ইকবাল, নূরুন নবী এবং আরো সবকর্মীরা সবাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত এবং সবারই শুতে যেতে রাত একটা দুটো বাজবে। কেউ কেউ হয়তো সারারাতেই ঘুমানোর অবসর পাবে না।

হেনা, আমি দু'জনেই এগারোটায় তৈরি হলাম। হেনা তাঁর স্টলের সব খাবার-দাবারও গুছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ফেরদেস আলী এখনো আসছেন না। তার মানে, অনুষ্ঠানের আয়োজন এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। শেষে ফেরদৌস এলেন ১২ টারও পরে। আমরা সবাই নিউব্রানসউইক স্কুলে গিয়ে দেখি অডিটোরিয়ামের সামনের বিরাট লবিতে সারি সারি টেবিল পেতে তার ওপরে বিভিন্ন জিনিসের স্টল বসে গেছে– বই, ম্যাগাজিন, কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন সামগ্রী, খেলনা, শাড়ি, টি-শার্ট, ভিডিও ক্যাসেট অডিয়ো ক্যাসেট– আরো কত কি। লবির ডানপাশের দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল বিরাট ক্যাফেটেরিয়া। সেখানেও এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে টেবিল পেতে বিভিন্ন খাবারের স্টল। ক্যাফেটেরিয়ার বাকি মেঝে জুড়ে টেবিল চেয়ার পাতা– বসে খাবার জন্য।

লবিতেই পূর্ব পরিচিত বহু জনের সঙ্গে দেখা হলো। নতুন অনেকে এগিয়ে এসে পরিচিত হলেন। নির্মলেন্দু গুণ বললেন, তিনি সাড়ে দশটাতে এসেছেন। এত দেরী দেখে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

দেরী আরো একটু হলো। অডিটোরিয়ামে ঢুকে দেখি অতি বিরাট অডিটোরিয়াম। কর্মীরা স্টেজে ও তার চারপাশে নানা কাজে ব্যস্ত। দর্শক এখনো

বেশি আসে নি। দর্শকভর্তি প্রেক্ষাগৃহ না হলে কি অনুষ্ঠান শুরু করতে মন চায়? কিন্তু কতো আর দেরী করা যায়। এদিকে যতো দেরী হবে, প্রোগ্রাম শেষে হতেও ততটাই, তাই কি তার চেয়েও বেশি দেরি হতে পারে।

শেষে পৌনে একটার সময় অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহাব সিদ্দিকী ঘোষণা করলেন আজকের এই অনুষ্ঠান 'প্রবাসে বৈশাখ' একটি আনন্দানুষ্ঠান হবার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেছে, লাখ লাখ লোক মারা গেছে, তারো বেশী মানুষ গৃহহারা হয়েছে, সেইজন্য আজকের এই অনুষ্ঠানকে ফান্ড- রেইজিং অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে এবং পুরো অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের ঘূর্ণিবিধ্বস্ত, দুঃস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো। এসোসিয়েশনের সভাপতি ড. ফেরদৌস আলী সংক্ষেপে দেশের ভয়াবহ দুর্দশার বিষয়টি উল্লেখ করে সবাইকে যথাসাধ্য ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য করার জন্য আবেদন জানালেন। এরপর আমাকে আহ্বান করা হলো অনুষ্ঠান উদ্বোধনের জন্য।

উদ্বোধন ঘোষণা করার কালে আবারো সবাইকে অনুরোধ করলাম বাংলাদেশের দুর্বিপাকগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করতে মুক্তহস্তে দান করার জন্য।

অনুষ্ঠান শুরু হলো সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে। প্রথম গানটি ছিল, 'মহাবিশ্বের মহাকাশে মহাকাল মাঝে।' আমি দর্শকের সারিতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে লাগলাম। শিল্পীদের মধ্যে তারেক আলীও গাইছিলেন। তাঁর স্ত্রী মিলিয়া আলীই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত। কিন্তু তারেক আলী এত ভালো গাইতে পারেন তা আমার জানা ছিল না। তাঁর গলাটিও বেশ গমগমে।

হাতের ছাপানো অনুষ্ঠানসূচির দিকে তাকালাম। অনেক অনেক অনুষ্ঠান। নাচ, গান, আলোচনা সভা, নাটক, বিভিন্ন বক্তার ভাষণ– সব মিলিয়ে বারো ঘণ্টার অনুষ্ঠান। সময় লেখা আছে সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা। কিন্তু অনুষ্ঠান তো শুরু হয়েছে পৌনে দু'ঘণ্টা দেরী করে। তাহলে কি সব শেষ হতে রাত ১২ টা – ১টা বেজে যাবে? সমবেত সঙ্গীতের পর এখন চলছে ইয়ুথ ফোরাম– কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে ভাব-ভাবনা জেগেছে, সে বিষয়ে বলছে। এটা শেষ হতে কয়েকটি কিশোরী মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুরু করল

স্টেজের পেছনের ড্রপসিনটা ভারি চমৎকারভাবে করা হয়েছে। সাদা কাগজে কেটে খুব বড় বড় অক্ষরে প্রথমে লেখা হয়েছে প্রবাসে বৈশাখ। তারপর প্রবাসে এবং বৈশাখ এই শব্দ দুটোর মাঝে নিচে ইলেক চিহ্ন (^) দিয়ে শব্দ দুটোর ওপরে লাল রঙের কাগজ কেটে লেখা হয়েছে ব্যথাতুর। আইডিয়াটা আমার খুব চমৎকার লাগল। লেখাগুলো একটু বাঁ দিক ঘেঁষে আছে। ডান দিকে ক্রন্দনরত শিশুকোলে এক দিশেহারা মায়ের ছবি। নিচে জলোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ। পরে শুনলাম

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ছবিগুলো কাগজ কেটে কেটে বানিয়েছেন। জাফরের লেখালেখি করার অভ্যাস আছে জানতাম, অনেক আগে তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ' বাংলাদেশে খুব নাম করেছিল। জাফর ইকবাল এদেশে আছেন অনেক বছর, পেশায় বিজ্ঞানী। তিনি যে আবার এ ধরনের চমৎকার ছবিও আঁকতে পারেন, তা জানা ছিল না।

অডিটোরিয়াম আস্তে আস্তে ভরে উঠছে। যাদের বাচ্চা আছে, তাঁরা বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। দুটো বাচ্চার বাবা-মা একটাকে কোলে নিয়ে অন্যটা স্ট্রলারে বসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাচ্চাদের জন্যই বেশীক্ষণ প্রেক্ষাগৃহে বসতে পারছে না। কোনো একটা বাচ্চা কাঁদতে শুরু করলে বাবা কিংবা মা স্ট্রলার ঠেলে বা কোলে নিয়ে বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কাফেটেরিয়াতেও অনেকে বসে বসে খাচ্ছেন। আমি দুটোর দিকে কাফেটেরিয়াতে গেলাম লাঞ্চ খাবার জন্য। দেখি নির্মলেন্দু গুণ, জ্যোতিপ্রকাশ ও পূরবী দত্ত বসে কথা বলছেন। হেনা আমার সঙ্গে কাফেটেরিয়াতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে খাবারের দাম দিতে দিলেন না। খাবার নিয়ে একটি খালি টেবিল দেখে বসলাম। পূরবীরা উঠে এসে আমার টেবিলে বসলেন। খেতে খেতে অনেক আলাপ হলো। একটু পরেই আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হবে তাতে ইকবাল বাহার চৌধুরী ও বেদুইন সামাদের সঙ্গে জ্যোতি প্রকাশও অংশ নেবেন। খাওয়া শেষ করে আমরা সবাই আবার প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলাম। আলোচনার বক্তব্য : গণতন্ত্রে উত্তরণ ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন ড. নূরুন নবী।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পর নাটক, তারপর কবিতার অনুষ্ঠান। এভাবে একটার পর একটা অনুষ্ঠান চলছেই। দর্শকরা কেউই একভাবে বসে সব অনুষ্ঠান দেখছেন না, তা দেখা সম্ভবও নয়। কারণ মাঝে মাঝে খাওয়া আছে, বাচ্চাদের খাওয়ানো আছে, স্টলগুলো ঘুরে দেখা ও পছন্দমতো কেনাকাটা আছে। আমি পৌনে চারটে পর্যন্ত অনুষ্ঠান দেখে তারপর ফেরদৌসকে বললাম, 'আমাকে একটু বাসায় দিয়ে এসো, খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

এইরকমই কথা হয়েছিল। আমি ক্লান্তবোধ করলেই একবার বাসায় গিয়ে রেস্ট নেব। আমার কি নোট স্পিচ (Key-note Speech) সন্ধ্যায়। তার আগে পর্যন্ত শরীর ভাল থাকা চাই। ফেরদৌস আমাকে তার বাসায় নিয়ে নামিয়ে দিয়ে এল। বললাম, 'ঠিক একঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যেয়ো। বেশিক্ষণ প্রোগ্রাম মিস করতে চাই নে।' আজ আবহাওয়াটা চমৎকার। ৬৫ ফারেনহাইট। না-শীত, না-গরম। ওয়েদারের জন্য শরীর বেশ চনমনে লাগে। সবাই তাই খুব উৎফুল্ল। গরম থাকলে আমি আরো আগে নেতিয়ে পড়তাম।

বিশ্রাম শেষে আবার এসে বসলাম অডিটোরিয়ামে। এখন স্টেজের ওপর হচ্ছে একটি নৃত্যানুষ্ঠান। অনেকের মধ্যে মাহমুদা আমিন ইরানীকে আবিষ্কার

করলাম। তাঁকে নাচের পোশাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে– মনে হচ্ছে একটি কিশোরী। মাহমুদা যে নাচতে পারেন, তা জানা ছিল না। এসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকার এই আরো একটি গুণ আবিষ্কার করে মুগ্ধ হলাম। মাহমুদা খানিকক্ষণ আগে আরো একটি নাচে অংশগ্রহণ করেছেন। সেটি দেখার সুযোগ আমার হয় নি। সে সময় কাফেটেরিয়াতে বসে খাচ্ছিলাম। নাচ শেষে ইরানী কাফেটেরিয়াতে এসে আমার সাথে কথা বললেন। বললাম, 'শুনলাম তুমি নাচবে। কখন হবে? আমি মিস করতে চাই নে।'

ইরানী হেসে বললেন, 'এই তো নেচে এলাম।' আমি একটু হতাশ হলাম। তবে প্রথমটা মিস করলেও পরেরটা দেখতে পেলাম।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম– এ একটা অমানুষিক পরিশ্রম ও বিশাল আয়োজনের ব্যাপার। বারো ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানমালার জন্য তৈরি হতে এদের কতো মাস যে সময় লেগেছে, কে জানে। এতগুলো নাচ গানের রিহার্সাল নিশ্চয় মাস দুয়েক ধরে হয়েছে। তারপর নাচের প্রতিটি ছেলেমেয়ের পোশাক তৈরি করা। সবই উদ্যোক্তাদের নিজেদেরকেই করতে হয়েছে। যারা সেলাই ভালো জানেন বা ভালোবাসেন, নিশ্চয় তাঁদের ঘাড়েই এই দায়িত্ব পড়েছে। এছাড়াও একটা ব্যাপার আছে, এতগুলো দলের সমন্বয়ে গঠিত এই অনুষ্ঠানমালা এমন সুশৃংখলভাবে স্টেজে প্রদর্শন করা চাট্টিখানি কথা নয়। মানব প্রকৃতির নিয়মানুসারে মত-বিরোধ, কথাকাটাকাটি, ভেতরে ভেতরে রেষারেষি, সুক্ষ্ম ঈর্ষা- এতসব রিপুকে দমন করে দলমত নির্বিশেষে সবাই একযোগে মিলে এই যে একের পর এক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করছেন, এর জন্য বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। বিদেশে প্রবাসী বাঙালিরা নিজেদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টায় এই আপ্রাণ পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

প্রবাসী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী নাসিমের সঙ্গে দেখা হলো। দেখা হল ড. নূরুন নবী, কাজী আরিফ, মিলিয়া ও তারেক আলী, কাশফিয়া ও রাজীব বিল্লাহর সঙ্গে। দেখা হলো নিনু ও তার স্বামীর সঙ্গে। নিনু ঢাকার 'সংবাদ'– এর সাংবাদিক মিনুর বোন। নিনুর স্বামী টুলু (ভালো নাম কাজী মোতাকাবিবর) প্রযাত চিত্রশিল্পী কাজী হাসান হাবিব– এর ভাই। হাসান যখন ঢাকায় মৃত্যুশয্যায় তখন টুলু ও নিনু ঢাকায় গিয়েছিলেন। তখনই আলাপ। নিনুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। মিনুর সঙ্গে ওঁর চেহারা ও কথাবার্তার এত মিল যে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, বুঝিবা মিনুর সঙ্গেই কথা বলছি।

কাশফিয়া আমার স্বামীর বন্ধু মান্নান সাহেবের মেয়ে। রাজীবের বাবা ও আমার স্বামীর আরেক বন্ধু। কাশফিয়া আজ অনুষ্ঠানে প্রথম দিকে গান গেয়েছে। দুপুরে বাড়ি গিয়ে বিকেলে আবার এসেছে। ওদের দুটো ছোট ছোট বাচ্চা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বাচ্চা নিয়ে এত ব্যস্ত যে স্থির হয়ে বসে অনুষ্ঠান দেখতে পারছে না।

এখানকার বাংলাদেশ মিশনের ডেপুটি পার্মানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ মহিউদ্দিন আহমদ অনুষ্ঠানে এলেন বিকেলের দিকে। মহিউদ্দিনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঢাকাতে, সেই ৮৬ সালেই। তাঁর বন্ধু বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুস্তাফিজুর রহমান (বর্তমানে মস্কোতে বাংলাদেশ মিশনে রাষ্ট্রদূত) যখন আমার 'একাত্তরের দিনগুলি' বইটি অনুবাদ করেন, তখন সেই বইয়ের (Of Blood and Fire) প্রকাশক খুঁজে দেবার ব্যাপারে মহিউদ্দিন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউ জার্সি ইতিমধ্যে আঠারো হাজার ডলার ডোনেশন তুলেছেন ত্রাণ তহবিলের জন্য। তার মধ্যে এক একটা মোটা অংকের ডলারের চেক কর্মকর্তারা তুলে দিলেন মহিউদ্দিনের হাতে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেবার জন্য। তুমুল করতালির মধ্যে মহিউদ্দিন আহমদ সেই চেক গ্রহণ করলেন।

জার্সী সিটি থেকে আমার বোনের মেয়ে রুবিনা ও তার স্বামী জাভেদ অনুষ্ঠানে এল শেষ বিকেলে। আমার বক্তৃতা হবার কথা ছিল সন্ধ্যা ৬টায় কিন্তু সব অনুষ্ঠানই ঘণ্টা দেড়েক করে পিছোচ্ছে। আমি ফেরদৌস আলীকে বললাম, 'দেখ, বেশি দেরী হয়ে গেলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তখন আর কিছু বলতে ভালো লাগবে না। ফেরদৌস বললেন, 'না খালাম্মা বেশি দেরি করার না। আপনাকে সাড়ে সাতটার মধ্যেই দেব।'

আমি সাতটার দিকে কাফেটেরিয়ায় গিয়ে একটু দই খেয়ে এলাম। পেট খালি হয়ে গেলে মাথার মধ্যে কেমন জানি করে, মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। আবার শক্ত খাবার খেতে পারি না। নিচের পাটিতে একটাও দাঁত নেই, তাই যখন কোথাও যাই, সঙ্গে ছোট সাইজের দু'একটা ইয়োগার্টের কার্টন রাখি। আমার এই অভ্যাসের কথা আগেই ফোনে জেনে হেনা বেশ কয়েকটা দইয়ের ছোট কার্টন কিনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন, আজ বাসা থেকে আসার সময় দুটো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। ভয়েস অব আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ড্রাইভ করে এসেছিলেন শুধু শনিবারের জন্য। অনুষ্ঠানে প্রথমে তিনি এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তারপর আবৃত্তি করেন। ইকবালের মা আনোয়ারা বাহার চৌধুরী (প্রয়াত) আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন। ইকবালের সন্ধ্যার সময় ডিসি ফিরে যাবার কথা। তিনি বললেন, 'খালাম্মা, বহুদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা। ভাবছি থেকেই যাই আজ' আমি উৎসাহিত হয়ে বলালাম, 'খুব ভালো হবে ইকবাল, থেকেই যাও। সবাই মিলে আড্ডা দেয়া যাবে।' ফেরদৌস আলী ও ইকবালকে অনুরোধ করলেন রাতটা তাঁর বাড়িতে কাটাবার জন্যে। ইকবাল রাজি হলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত ১১টা পেরিয়ে গেল। আমি অবশ্য অতক্ষণ থাকতে পারি নি। রাত সাড়ে দশটার পর বেশ ক্লান্তবোধ করতে লাগলাম।

বিকেলের একঘণ্টা বিশ্রামের সময়টা বাদ দিলে, বলতে গেলে প্রায় সারাদিনই আমি এখানে। বহুবছর পরে সারাদিনব্যাপী একটা অনুষ্ঠানে আমি থাকতে পারলাম। কিন্তু এখন আর পারছি না। ফেরদৌসকে বললাম, 'আমাকে বাড়িতে রেখে এসো'।

ফেরদৌস আমাকে তাঁর বাড়িতে রেখে আবার অনুষ্ঠানের জায়গায় ফিরে গেলেন। আমি বাসায় পোশাক পালটে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিলাম। সবাই ফিরে আসলে তখন আবার উঠে আড্ডা দেব।

ইকবালসহ ফেরদৌসরা ফিরলেন রাত পৌনে একটায়। সর্বশেষ অনুষ্ঠান 'বাংলা নাটকে গানের প্রয়োগ' নাকি সবচেয়ে ভালো হয়েছে। শুনে আফসোস হলো এবং নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যকে ধিক্কার দিলাম।

হেনা বললেন, 'ওখানে ভলো করে ডিনার খাওয়া হয় নি। সবাই আরেকবার খাই, আসুন।' ফেরদৌস এবং আমি দু'জনেই সোৎসাহে সমর্থন করলাম। সত্যিই তো, সেই ৮টা – ৯টার সময় ডিনার খাওয়া হয়েছে। কাজের ধান্দায় হেনা, ফেরদৌস কেউই ভালো করে খেতে পারেন নি। তারপরে এত খাটুনি, অনুষ্ঠান শেষে সব গুছিয়ে যার যার নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে করে আনতে হয়েছে, খাটাখাটি কম যায় নি। আর আমার তো, না খাটলেও খনিক পর পর খিদে পেয়ে যায়।

আবার সেই রাত একটায় ভাত, মাছ, গোশত, ডাল, ভাজি সব গরম করলেন হেনা। আমরা সবাই একটু একটু করে খেলাম, তারপর রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ইকবাল, ফেরদৌস, হেনা আর আমি আড্ডা দিলাম। ইকবালকে পরদিন সকালেই ডিসির পথে রওনা হতে হবে। তাই সবার ভোর রাত সাড়ে তিনটেয় ঘুমোতে গেলাম।

ইকবার ব্রেকফাস্ট খেয়েই রওনা হবে, তাই আরেক দফা গল্প করার জন্য সাড়ে আটটাতেই উঠে গেলাম। মুখ ধুয়ে নিচে নেমে দেখি, হেনা আগেই উঠে রান্নাঘরে রুটি, পরোটা বানাতে বসে গেছেন। বললাম, 'করছ কি? এত পরিশ্রম করার দরকারটা কি ছিল? পাউরুটি মাখন, ফলের রসই তো যথেষ্ট হতো।'

হেনা তো মানবেন কেন? বিদেশে বাস করলেও বাঙালি অতিথেয়তার ঐতিহ্য থেকে সরে আসতে পারেন না। সেই সকালে রুটি, পরোটা, ভুনা গোশত, মিষ্টি– সব পদ টেবিলে সাজিয়ে তবে তাঁর শান্তি।

সাড়ে দশটা পর্যন্ত খাবার টেবিলে বসেই আবার আড্ডা দেয়া গেল। তারপর ইকবাল উঠলেন। এবার রওনা দিতে হয়।

বাইরে আজ চমৎকার আবহাওয়া। উজ্জ্বল রোদ, তাপমাত্রা ৭২ ফারেনহাইট। ইকবাল গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। আমি বললাম, সাবধানে ড্রাইভ কোরো। তারপর হাত নাড়লাম। ফেরদৌস, হেনাও হাত নাড়লেন। গাড়ি রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

জাহানারা ইমামের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে তিনি নিউজার্সিতে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন। আমার জানামতে এ দুদিন ছিল যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর আনন্দের সময়ের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য অনুষ্ঠান।

কবি গুণের জুয়া খেলা

নিউ জার্সি বাংলাদেশ সমিতির একই প্রবাসে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদের বিখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণ। কবি গুণ শনিবারে আবৃত্তি করলেন তার সেই বিখ্যাত কবিতা– স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হল। হল ভরতি দর্শকবৃন্দ কবি কণ্ঠে আবৃত্তি শুনে বাতাস কাপানো করতালি দিয়ে কবিকে অভিন্দন জানালেন।

দ্বিতীয় দিন রবিবার বিশেষ অতিথির ভাষণ। সাপ্তাহিক বাঙ্গালী সম্পাদক কৌশিক আহামেদ কবি গুণকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবি গুণ বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে জাতির পিতাকে হত্যার নিন্দা করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার না করে তাদেরকে বিদেশে বিভিন্ন বাংলাদেশের দুতাবাসে চাকুরি দেওয়ার জন্যে। তিনি আরও সমালোচনা করলেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে। তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়ে তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেওয়ার জন্যে।

কবি যখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করছিলেন, পিছন থেকে দুএকজন মৃদু প্রতিবাদ করলেন। জাফর ইকবাল এবং অন্যান্যরা বিশেষ অতিথির ভাষণকালে প্রতিবাদ করার জন্যে আপত্তি করলেন। ইতিমধ্যেই কবি গুণের ভাষণ শেষ হয়েছে। তাই এটা নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হল না। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

কবি নির্মলেন্দু গুণ আমার একজন প্রিয় কবি। রাজনৈতিক কবিতার জন্য বিশেষভাবে তার পরিচিতি আছে। আমি তার ভক্তকূলে নাম লিখি ১৯৬৯, মুক্তি সংগ্রামের সময় লেখা তাঁর হুলিয়া কবিতা পাঠ করে। মনে হয়েছিল তিনি আমার কথা, আমাদের কথা লিখেছেন। তারপর আরও দুটি কবিতা আমার কাছে খুবই প্রিয়। স্বাধীনতা এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হল এবং আমি আজ কারো রক্ত

চাইতে আসিনি। আজও আমি যেখানেই যাই, সুযোগ পেলেই আবৃত্তিকারকে অনুরোধ করি স্বাধীনতা এ শব্দটি কবিতার আবৃত্তির জন্য। এখানো আমার শরীরের রক্ত টগবগিয়ে উঠে, শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় যখন আবৃত্তিকারের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

কবি নির্মলেন্দু গুণ তিনবার যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তিনবারই আমি কোন না কোন ভাবে এর সাথে জড়িত ছিলাম। তিনি একাধিবার অনেকদিন আমাদের বাসায় ছিলেন। গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্ব। কবি গুণের পাগলামী বা খাম খোয়ালীর কথা তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা সবাই জানে। কাছে থেকে দেখা এরকম একটি পাগলামীর ঘটনার সাথে আমি জড়িত ছিলাম। ভেবেছিলাম এ ঘটনাটি আমি গোপন রাখবো। প্রকাশ হলে কবি পাছে লজ্জিত বা অপ্রস্তুত হন তাই ঘটনাটি আমি কাওকে বলিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের ছাড়া। কিন্তু কিছুদিন পরে অবাক হলাম কবি গুণের একটি বই পেয়ে।

ঘটনাটি খুলেই বলি। প্রবাসে বৈশাখের অনুষ্ঠানে কয়েকদিন পর তারিক আলী এবং মিলিয়া আলীর বাসায় একটু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি গুণ প্রধান অতিথি। আমন্ত্রিতরা অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায়ের ছেলে ড. সুমিত রায়। সুমিত বাবু একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কিন্তু তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খুবই সংস্কৃতিমনা। সঙ্গীতপ্রিয় দম্পতি। কবিতা ও সাহিত্যপ্রেমিক। বাংলাদেশ থেকে অতীতে যারা এসেছেন, যেমন ওয়াহিদুল হক, সানজিতা খাতুন, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখদের সাথে তারা আড্ডায় মিলিত হয়েছেন।

কবি গুণ নিউ ইয়র্কে অবস্থান করছিলেন। আমি ওনাকে অনুষ্ঠানের আগের দিন নিউ জার্সিতে আসতে অনুরোধ জানালাম যাতে অনুষ্ঠানে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

কবি জানালেন অনুষ্ঠানের আগের দিন তিনি নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে জুয়া খেলতে যেতে চান। আমি বললাম, আপনাকেতো কয়েকদিন আগেই আটলান্টিক সিটি দেখিয়ে এলাম। তিনি বললেন, সেটা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে, তার পর সে অল্প সময়ে আমি জুয়া খেলে হেড়েছি। এবার বেশীক্ষণ খেলব এবং অবশ্যই জিততে হবে।

অতিথির অনুরোধ রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্তব্য। পাছে যদি নিউ জার্সিতে না আসেন, তবে পরের দিনের অনুষ্ঠানটি হবে না। সেদিন আমার অফিসে জরুরী কাজ। আমার পক্ষে কবিকে নিয়ে আটলান্টিক সিটি যাওয়া সম্ভব ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে কবি গুণের দুই ভক্তকে পেলাম। ড. রুহুল আমিন এবং তার স্ত্রী ইরানী। স্থির হল, কবি ট্রেনে নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ জার্সির

মেটওয়ান স্টেশনে আসবেন। রুহুল এবং ইরানী কবিকে ওখান থেকে উঠিয়ে গাড়িতে আটলান্টিক সিটিতে নিয়ে যাবেন। রুহুল এবং ইরানীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম কবিকে দিন শেষে অবশ্য সঙ্গে নিয়ে ওদের বাসায় নিয়ে আসতে এবং পরের দিন কবি গুণসহ ওরা তারিক আলী ও মিলিয়া আলীর অনুষ্ঠানে আসবে। ওরা রাজী হল। কবিকে বললাম তিনি অবশ্যই রুহুল ইরানীদের সাথে সন্ধ্যায় ওদের বাসায় ফিরে আসবেন। তিনি কথা দিলেন অবশ্যই ওদের সাথে ফিরবেন। (ড. রুহুল আমিন কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করেছেন।)

রাতে রুহুল এবং ইরানী জানালো কবি গুণ ওদের সাথে ফিরেন নি। জুয়া খেলা নিয়ে এতই মগ্ন হয়েছেন যে তিনি আরও বেশ কিছুক্ষণ খেলবেন। ওদেরকে চলে যেতে বলেছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন কয়েক ঘণ্টা পর রাতের বাসে রুহুলদের বাসায় ফিরবেন। আমি এ সংবাদ শুনে চিন্তিত হই। এক ঘণ্টা পর পর রুহুলকে কল করে খোঁজ নিচ্ছি। না তিনি রাত ১২টার মধ্যে ফিরেন নি। চিন্তায় ঘুম আসছিল না। তিনি যদি জুয়া খেলে সব টাকা হারান তবে ফিরবেন কিভাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রুহুলকে কল করে জানলাম তিনি রাতে ফিরেন নি। আমাকে বা ওদেরকে কল করেন নি। মহা দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম। অফিসে জরুরি মিটিং আছে; তাই ছুটলাম সেখানে। অফিসে গিয়ে রুহুলকে আবার ফোন করলাম। কবি গুণের কোন খবর নেই।

কবির নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলল। তার উপর তারিক আলী মিলিয়া আলীর বাসায় অনুষ্ঠানের কথা। যদি কবি গুণ অনুপস্থিত থাকেন, তারিক ও মিলিয়ার সাথে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা। কবি গুণকে আটলান্টিক সিটিতে পাঠানের সিদ্ধান্ত ছিল আমার একার। তাঁর কিছু হলে সে দায়ভার আমার উপরেই বর্তাবে।

অফিসে মিটিং এর মাঝে একবার বিরতি দেওয়া হয়েছে। ছুটে এলাম অফিস কক্ষে। আবার রুহুলকে ফোন করলাম। না কোন খবর নেই গুণদার। রুহুলের সাথে কথা শেষ করেই রিসিভার রাখতেই আবার ফোন বেজে উঠল। ধরলাম। অপারেটর এর কণ্ঠস্বর। তোমার একটি কালেক্ট কল আছে। তুমি কি রিসিভ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে কল করছে। উত্তরে জানালো মি. গুণ। আমি সাথে সাথেই বললাম, হ্যাঁ আমি রিসিভ করব। যদিও আমাদের কোম্পানিতে কালেক্ট কল রিসিভ করা নিষিদ্ধ। কালেক্ট কল মানে হলো যে কলটি রিসিভ করে, তাকে কলের জন্য খরচের দাম পে করতে হবে।

আমি গুণদাকে এক নাগারে প্রশ্ন করলাম– আপনি কোথায়, কেমন আছেন, কেন রাতে ফিরলেন না। কোন দুর্ঘটনা হয়নি তো?

তিনি যা বললেন তার সারসংক্ষেপ হলো, তিনি জুয়া খেলে সব পয়সা

হারিয়েছেন। রাত কাটিয়েছেন ক্যাসিনোর রিসেপশন রুমের সোফায়। খাবারের পয়সা নেই। বাসের টিকেট কেনার পয়সা নেই।

আমি সব শুনে একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলাম। আপনি এখন কোথায়?

ভাগ্যক্রমে তিনি জায়গাটির সঠিক ঠিকানা বলতে পেরেছিলেন। আমি বললাম, আপনি ঠিক ওখানেই থাকবেন। একটু নড়চড় করবেন না। আমি ৩০ মিনিটের মধ্যে টাকা পাঠাচ্ছি। মনে হল তিনি আশ্বস্ত হলেন। বললেন, সারারাত না খেয়ে কাটিয়েছি। আধাঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারব। আমি বললাম, আমি আপনাকে ২৫ ডলার পাঠাচ্ছি। ১৫ ডলার দিয়ে প্রথমেই বাসের টিকেট কিনবেন। তারপর বাকি পয়সা দিয়ে প্রাতরাশ সারবেন। ক্যাসিনোর দিকে পা বাড়াবেন না। আর কোন জুয়া খেলা নয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন।

আমেরিকাতে যেকোন জায়গায় দ্রুত টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সে প্রতিষ্ঠানটির নাম ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন (Western Union)। কত দ্রুত টাকা পাঠানোর প্রয়োজন, সে মোতাবেক টাকা পাঠানোর ফি ধার্য করা হয়। আমি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নকে কল করলাম। তখন সকাল ১০টা। আটলান্টিক সিটিতে ২৫ ডলার পাঠানোর অনুরোধ করলাম। প্রাপক নির্মলেন্দু গুণ। আধা ঘণ্টার মধ্যে টাকা পৌছানো সম্ভব। তার জন্যে টাকা পাঠানোর ফি ৫০ ডলার। অর্থাৎ আমার পকেট থেকে ৭৫ ডলার খরচ করে গুণদার কাছে ২৫ ডলার পৌছাবে আধাঘণ্টার মধ্যে। বিপদে আপদে এই ব্যবস্থাটি মন্দ নয়।

আমি ইচ্ছে করে বেশি ডলার পাঠালাম না পাছে গুণদা সে ডলার দিয়ে আবার জুয়া খেলতে বসে পরে।

আগেই উল্লেখ করেছি এ ঘটনাটি আমি চেপে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর গুণদার লেখা আমেরিকায় জুয়া খেলার স্মৃতি নামে একটি বই হাতে এলো। গুণদার অটোগ্রাফ দেওয়া বকুল এবং আমার নামে। উৎসর্গ লিস্টে আমার নাম লিখতে ভুলেন নি। কবি নির্মলেন্দু গুণের নিজ ভাষায় তাঁর গ্রন্থে জুয়াখেলার স্মৃতি খুব সরসভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা আমি চেপে যেতে চেয়েছিলাম। কবি অবলিলায় তা তাঁর পাঠকের সাথে ভাগ করতে একটু দ্বিধাগ্রস্থ হন নি। নিম্নে বই এর কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা হলো–

"নিউ জার্সি বাংলাদেশ সোসাইটির আমন্ত্রণে আমি আমেরিকায় যাই ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। আমেরিকার বড় শহর নিউ ইয়র্ক। শুধু আমেরিকার নয়, পৃথিবীরও। আমি একটি দরিদ্র দেশে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়েছি। আমেরিকার শহরগুলোর পথে-ঘাটে, দোকানপাটে, গগনচুম্বী ভবনে ভবনে ছড়ানো-ছিটানো ঐশ্বর্যের সমাবেশ দেখে আমার তো মাথা খারাপ হতেই পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর যা স্বাভাবিক, আমার বেলায় সর্বদাই তা ঘটে। আমি স্বাভাবিক ব্যাপারগুলো একেবারেই এড়াতে পারি না। আমেরিকায় যাবার পর

আমার মাথাটা সত্যি সত্যিই খারাপ হয়ে যায়। আর আমার ঐ মাথা-খারাপ হওয়ার ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় জুয়া খেলার প্রতি আমার অদম্য আগ্রহের ভিতর দিয়ে।

আমেরিকায় যাবার কিছুদিনের মধ্যেই একবার আটলান্টিক সিটিতে জুয়া খেলে এসেছি। ডঃ নূরুন নবী আমাকে নিউ জার্সি থেকে নব্বই মাইল পথ ড্রাইভ করে আটলান্টিক সিটির জুয়ার মেলায় আমাকে নিয়ে গেছে। সেবার আমাদের সঙ্গে কাজী আরিফও গিয়েছিল। কাজী আরিফ তখন নিউ ইয়র্কে থাকতো। সেবার আটলান্টিক সিটিতে এক-দুপুর খেলছিলাম, কয়েক ঘন্টার জন্য। আমেরিকান ক্যাসিনোতে আমার জুয়া খেলার শুরুটা যথারীতি হার দিয়েই হয়েছিল।

১৯৯৩ সালে, যখন আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাই, আমাকে আটলান্টিক সিটিতে নিয়ে গিয়েছিল সর্বকর্মবিশারদ, বন্ধুবৎসল তারিক মাহবুব। আমি সেই রাতে শ দুয়েক ডলার হেরেছিলাম। তারিক জিতেছিল শ' পাঁচেক ডলার। সুতরাং আমার হার দিয়ে তেমন কিছু বোঝা যাবে না। আমি জুয়ার জয় ধরে রাখতে পারি না। অনেকে পারে। তারিক পেরেছিল। যারা পারে তারাই জেতে। তারা রাতারাতি ধনীও হয়। আমি হইনি বলে তাই আমার তেমন কোনো দুঃখ নেই। সুখস্মৃতি হিসেবেই আমি আমেরিকায় জুয়া খেলার অভিজ্ঞতাকে মনে রেখেছি।

এবার ঐ রাতের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমরা ট্রাম্প তাজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাইরে খুব ঠাণ্ডা ছিল। ভেতরে গরম। শারীরিকভাবেই আগের চেয়ে তাই সুস্থ বোধ করলাম। তারপর যথারীতি বিশ ডলার ভাঙিয়ে চল্লিশটি কোয়ার্টার নিয়ে গিয়ে মনে-মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপ করতে করতে গিয়ে বসলাম স্লট মেশিনের সামনে। মেশিন পছন্দ করাটাও একটা বড় ব্যাপার। কখন কোন মেশিন কাকে খাবে আর কাকে দেবে, তার কিছুই বোঝার জো নেই। অনেকটাই অন্ধকারে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। তবে অভিজ্ঞজনরা বলেন, খেলা শুরু করার আগে একটু ঘুরে ঘুরে মেশিন যাচাই বাছাই করে নেওয়া ভালো। ঐ পদ্ধতিতেই তারিক জিতেছিল। আর যাচাই-বাছাইয়ে যথেষ্ট সময় না দেওয়ার কারণে আমি হেরেছিলাম– এটাই ছিল তারিকের বক্তব্য। আসলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারাটা খুব কঠিন কাজ।

ইরানী এবং আমিন আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য কিছু ধাতব মুদ্রা নিয়ে আমার সঙ্গে বসলো। কিছু লাভও হলো তাদের। কিন্তু আমার শুধুই যাচ্ছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। আমার রাগ চড়ে গেল। মাথায় রক্ত উঠে গেল। হার জিনিসটা আমি একেবারে সইতে পারি না। আমার খুব রাগ উঠে যায়। তখন আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এদিকে রাত রাড়ছে। ইরানী আর আমিন আমাকে তাড়া দিচ্ছে, দাদা, চলেন আর খেলবেন না। ফিরতে হবে তো এতটা পথ। উঠছি-উঠছি করে করে আরও কিছুটা সময় ওদের আটকে রাখার পর এক-পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্ত

নিলাম, যাবো না। খেলবো। প্রাণ ভরে খেলবো। এভাবে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাওয়াটা উচিত হবে না। হাতে আরও কিছু ডলার আছে। তা ছাড়া আমার কিছু ডলার রয়ে গেছে পূরবীর (ডঃ পূরবী দত্ত) হেফাজতে। সুতরাং ভাবনা কি? আমি তো শূন্য হাতেই আমেরিকায় এসেছি। শূন্য হাতেই দেশে ফিরে যাবো। কথাটার মধ্যে একটা মারফতী ভাব আছে– তা থাকুক।

আমার না যাওয়ার কথা শুনে ইরানী আর আমিন আকাশ থেকে পড়লো। বলেন কি? এখন না গেলে পরে যাবেন কি করে? গাড়ি পাবেন কোথায়? আর ডলার যখন সব খুইয়ে ফেলবেন, তখন? বাসেও যেতে পারবেন না। কাল সন্ধেবেলায় যে তারিক আলী আর মিলিয়া আলীদের বাসায় একটা অনুষ্ঠান আছে সে কথাও তারা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। সেখানে আমার প্রিয় অভিনেতা বিকাশ রায়ের পুত্র শ্রী অমিত রায় আসবেন। তাছাড়া নিউ জার্সির অনেক বাঙালিই সেখানে আসবেন আমার সঙ্গে কথা বলতে, আমার কবিতা শুনতে।

আমি বললাম, আমি জানি। আমার জন্য ভাববেন না। আমি কালকে সন্ধ্যের আগে নিউ জার্সিতে ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবো। কীভাবে যাবো তা জানি না, তবে যাবো। অবশ্যই যাবো। বললাম, একটু বিপদে না পড়লে কি ভ্রমণ কখনও স্মরণযাগ্য হয়? একটু বিপদে পড়তে দিনই না। দেখা যাক কী হয়।

শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হলো। রাত বারোটার পর ইরানী আর আমিন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আটলান্টিক সিটিতে ট্রাম্প তাজের ভিতরে একা রেখে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আমাকে বাস ভাড়াটা আলাদা করে রেখে দেবার জন্য কিছু ডলার দিতে চেয়েছিল– কিন্তু আমি নিইনি। তাতে কোনো লাভ হতো না। কেননা, বাসা ভাড়ার আকারে হোক আর যে আকারেই হোক, আমার কাছে যে কিছু ডলার অবশিষ্ট আছে তা আমি তো জানতামই। আমি তো ঐ মেশিনগুলোর এজেন্ট হিসেবেই কাজ করবো। ফলে যদি হেরেই যাই তো ওটা সহই হারবো। তার চেয়ে নিজের কাছে যা আছে তা দিয়েই ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ভালো। এরূপ বুঝিয়ে আমি ওদের বিদায় করলাম। বিরসবদনে, আমেরিকায় নবাগত জুয়াড়ী কবিকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করতে না পারার বেদনা বুকে নিয়ে ইরানী ও আমিন ফিরে গেল। তাজমহলের গেট পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে, মনে-মনে ওদের দুজনের জন্য একটি সন্তানের প্রার্থনা জানিয়ে আমি ফিরে এলাম আমার প্রিয়তমার কাছে–একা। এবার আমি একা। আহ, কী আনন্দ! যখন নিশ্চিত হলাম যে, আমাকে পেছন থেকে তাড়া দেবার বা পাহারা দেবার কেউ নেই আর, তখন কী যে ভালো লাগলো আমার। সে ভাষায় বুঝানো যাবে না। এবার প্রাণ ভরে খেলবো। একা-একা। কী মজা! মনে হলো এবার আমি সত্যিকারের স্বাধীন। আজ আমার ১৬ ই ডিসেম্বর।

স্বাধীনতার অযোগ্য ব্যক্তি স্বাধীনতা পেলে যা হবার তাই হলো– আমি দ্রুত

হারতে লাগলাম। রাত বাড়ছে দিনের সাথে পাল্লা দিয়ে, আর হার বাড়ছে রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে। ভাটার টান থেকে আমার পকেটের মুদ্রাগুলোকে বাঁচানোর জন্য আমি এক-পর্যায়ে পাঁচ সেন্টের মেশিনের নেমে গেলাম। যাতে হারতে কিছুটা সময় লাগে। এদিকে মোগল হারেমের উর্বশীদের পরিবশিত মদ-চা-কফি গিলে চলেছি। তারা আমাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে। বলছে, মেশিন বদল করো। আমি আর কতো মেশিন বদল করবো? আমি মেশিন বদল করছি কিন্তু ভাগ্য বদল করবো কী করে? ভাগ্য তো আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

এমন সময় হঠাৎ শুনি খেলা বন্ধ করার জন্য মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। খেলা বন্ধ করে ক্যাসিনো ত্যাগ করার জন্য বলা হচ্ছে। শুনে তো আমার আত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। বলে কি? এখন ক্যাসিনো বন্ধ হয়ে গেলে আমি যাবো কোথায়? আমি তো ভেবেছিলাম সারারাত খেলবো–তারপর সকালের দিকে রওয়ানা দেব নিউ জার্সির উদ্দেশ্যে। রাতে ঘুমানোর কোনো প্রয়োজনই পড়বে না। আমিন বা ইরানীও আমাকে এরকম কোনো ধারণা দেয়নি। আসলে ওরাও তা জানতো না।

আমি বললাম আমি যাবো না। আমি রাতভর খেলে কাটাবো। সিকিউরিটির লোকজন ছুটে এলো আমার কাছে। বললো, এমনটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমি বললাম, দেখো, আমি তো জানতাম না, জানলে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিউ জার্সি চলে যেতাম। এখন আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। হোটেলে থাকার মতো টাকাও আমার অবশিষ্ট নেই। প্রায় সবই হেরে গেছি। এখানে আমি কিচ্ছু চিনি না। আমেরিকায় আমি নতুন। সুতরাং আমার থাকার বন্দোবস্ত তোমাদেরই করতে হবে।

সিকিউরিটির লোকজন অধিকাংশই কালো। একেকজনের চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখলে যুক্তিহীন তর্ক করবার সাহস উবে যেতে চায়। ওরা ইচ্ছে করলে আমাকে স্লট মেশিনের সামনে থেকে একটা ছোট্ট নেংটি ইঁদুরের মতো ধরে তুলে আটলান্টিকের অতল জলরাশির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আমিও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি বললাম, দেখো, তোমরা আর যাই করো তাজমহলের অসম্মান করো না। আমি তাজমহলের দেশের মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষরাই একদিন বিশ্বখ্যাত তাজমহল তৈরি করেছিলেন। তোমরা ঐ পবিত্র তাজমহলের নামে ক্যাসিনো চালু করেছো– আমরা কিচ্ছু বলি নি। কিন্তু বলতে পারতাম। এরপর আমাকে যদি তোমরা এই রাতে এই নকল তাজমহল থেকে তাড়িয়ে দাও, দিতে পারো। তোমাদের সঙ্গে আমি শক্তিতে পারবো না। কিন্তু মনে রেখো, আমি দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই নিন্দা করবো। সেটি মিঃ ট্রাম্প সাহেবের জন্য ভালো হবে না। আর তোমরা যদি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো তাহলে আমি তোমাদের কথা ভালো লিখবো, তাতে তোমাদেরই লাভ হবে।

ওরা প্রথমে বলেছিল, বক্তৃতায় কোনো কাজ হবে না। কিন্তু দেখলাম আমার বক্তৃতায় কিছুটা কাজ হয়েছে। আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর, আমার পাঁচজনের সমান একজন কালো এসে আমাকে বললো, ঠিক আছে, তোমার জন্য আমরা আইন ভঙ্গ করছি। তুমি রাতের জন্য আমাদের ওয়েটিং রুমে থাকো। সোফাতে ঘুমাতে পারবে তো? একটু কষ্ট হবে বৈকি।

আমি ভাবলাম যা পাওয়া যায় তাই লাভ। না হলে তো রাস্তায় থাকতে হবে। আমি বললাম, আমি রাজি। বাইরে যা ঠাণ্ডা– মরে যাবো নির্ঘাৎ। তখন আমাকে একজন ঐ ওয়েটিং রুমে নিয়ে গেল। সেখানে বাইরের কেউ নেই। কিছু লোক কক্ষটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ করছিল আর ইংরেজী গান গাইছিল। আমি একটি নরোম সোফা বেছে নিয়ে তাতে শুয়ে পড়লাম। সিকিউরিটির ঐ কালো লোকটি আমাকে নির্ভয়ে ঘুমানোর অভয় দিয়ে চলে গেল।

খিদে পাবে না বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু বেশ খিদে পাচ্ছিল। তবু কিছু খেতে সাহস হচ্ছিল না। সামনে পড়ে আছে অনন্তকাল। পকেটে নেই পয়সা। এত সহজে খাওয়া চলবে না।

পরের বাস স্টেশনটিকে বাস স্টেশন বলা যায়। সেখানে লোকজনের চলাচল আছে। একটি বেশ উন্নতমানের অফিসও রয়েছে। বাসও আসছে যাচ্ছে। পরিবেশটা পরিচিত লাগল। বুঝলাম এবার ঠিক জায়গায় এসে গেছি। একটা উপায় হবেই।

এবারও একজন কালো পুলিশ। আমি কালো পুলিশ পেয়ে খুশি হলাম। হাজার হলেও আমাদের রঙের কাছাকাছি। আমেরিকার কালোরা তুলনামূলকভাবে ব্যথিতজন। তাই আমার অসুবিধার কথা তাঁর কাছে বললে সহজে বুঝবে। কী যাতনা বিষে...ইত্যাদি।

ঐ কালো ভদ্রলোককে আমি সবিস্তারে আমার সমস্যা বুঝিয়ে বললাম। তিনি মন দিয়ে শুনলেন। ভাবলাম এবার কাজ হবে– তিনি আমাকে কোনো একটি বাসে তুলে দিয়ে বলবেন, এই হলো তোমার বাস। তুমি চলে যাও, আমি বাসের কণ্ডাক্টরকে বলে দিচ্ছি। আর বাসের কণ্ডাক্টর ফাজিলের মতো হেসে বলবে, ঠিক আছে ওস্তাদ।

কিন্তু না, তিনি এমন কিছুই বললেন না। তিনি বললেন, তোমার বন্ধুদের ফোন নম্বর তোমার সঙ্গে আছে?

আমি বলাম, হ্যাঁ আছে।

তিনি বললেন, যাও, ঐ যে পাবলিক ফোনের বুথ আছে, ওখানে গিয়ে তোমার বন্ধুকে ফোন করো। কালেক্ট কল করতে পারো– তোমার বন্ধু ফোনের পয়সা শোধ করবে। তোমাকে পয়সা দিতে হবে না। তাঁর কাছে বলো তুমি এই বাস স্টেশনে আছো। সে তোমার জন্য সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাঠাতে পারবে। তুমি

ঘাবড়াচ্ছো কেন? কোনো চিন্তা নেই–দিস ইজ আমেরিকা।

আমি তাঁর মুখে আমেরিকার চমৎকার ব্যবস্থাপনার কথা শুনে যে খুব অবাক হয়েছি, তা বুঝতে পেয়ে তিনি আপন কৃতিত্বে প্রাণ খুলে হাসলেন। কালো মুখের ভিতর থেকে তাঁর সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে এলো। তখন আমার মনে হলো বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল আছে। কালোদের দাঁত কালো হলেই ভালো হতো।

আমি পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে কিছুক্ষণ ডায়াল করতেই নবীকে পেয়ে গেলাম। ডঃ নূরুন নবীর কণ্ঠে টাঙ্গাইলের আন্তরিক বাংলাভাষা শুনে আমার কী যে ভালো লাগলো। দীর্ঘ সময় ধরে বিচ্ছিন্ন থাকার পর মহাশূন্যযাত্রীর সঙ্গে যেন ভূপৃষ্ঠের চিন্তিত বিজ্ঞানীর কথা হচ্ছে– এমন ভাবই ফুটে উঠলো আমাদের আলাপে। তারপর আমি ঐ ভদ্রলোকের কথামতো তাঁকে বললাম–আমার জন্য টাকা পাঠান। আমি এখানে আটকা পড়ে আছি। সকালে ভিক্ষা শুরু করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। আপনার অনুমতি পেলে ভিক্ষা শুরু করতে পারি। আপনি কি বলেন?

নবী উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে বলল, এমন সর্বনাশের কথা আর বলবেন না। আপনি অপেক্ষা করুন আমি এক্ষুনি টাকা পাঠাচ্ছি। কত দরকার? বেশি পাঠাবো না। তাতে আপনি আবার খেলতে বসে যেতে পারেন। তাই যা ভাড়া তাই বলেন।

আমি নবীর দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারলাম না। সে ঠিকই ধরেছে। বললাম, পঁচিশ ডলার পাঠালেই চলবে। ভাড়া হচ্ছে ষোল ডলার। তাতে আমার নয় ডলার বাঁচবে–হাতে আছে দশ–অর্থাৎ টিকিট কাটার পরও আর হাতে থাকবে ১৯ ডলার– তাজমহলে না গিয়ে আমি যদি কাছের কোনো ক্যাসিনোতে যাই, তো কিছুক্ষণ খেলতে পারবো।

আমি ফোন সেরে গিয়ে ঐ ভদ্রলোকের কাছে বললাম– কাজ হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ। আমার বন্ধু আমার নামে পঁচিশ ডলার পাঠাবে। আমার নাম এ-ই, বলে একটি কাগজে আমার নামটি লিখে দিলাম। তিনি ঐ কাগজ নিয়ে ভিতরে গেলেন। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আমি ঐ স্থান ছেড়ে যাই না। ভাবি কী জানি আবার কোন ষড়যন্ত্রে পড়েছি কে জানে। ঐ লোক টাকা পেয়েও যদি বলে, তোমার নামে কোনো টাকা আসেনি–তুমি ঐ রিহেবিলিটেশন সেন্টারেই চলে যাও–তবে?

এরকম যখন ভাবছি–তখনই আমার ডাক পড়লো। ঐ ভদ্রলোক আমাকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন নাও, এখানে সই করো। দেখলাম আমার নামের পাশে পঁচিশ ডলার লেখা আছে। আমি নাম সই করে, পঁচিশ ডলার হাতে নিয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে মহানন্দে বেরিয়ে এলাম।

এখানেই আমার গল্পটি শেষ হতে পারতো। কিন্তু না এরপরও গল্প কিছুটা

বাকি আছে। বিকেল পাঁচটায় বাস। তখন ঘড়িতে বাজে আড়াইটার মতো। সুতরাং হাতে আছে আড়াই ঘণ্টা সময় এবং পকেটে আছে ১৯টি ডলার। পাঠক, আপনিই বলুন, আমি যদি পকেটে টাকা এবং ঘড়িতে সময় থাকতেও আবার লাক ট্রাই না করে চলে আসতাম, তবে কি তা ভালো হতো?

না, ভালো হতো না। তাই চলমান ফুডশপ থেকে একটি হট ডগ খেয়ে আমি হট ডগের মতোই ছুটলাম নিকটবর্তী ক্যাসিনোটির উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম। ঐ ক্যাসিনোটির মালিকও ঐ ট্রাম্প সাহেবই। ক্যাসিনোর নাম ট্রাম্প প্লাজা। দ্রুত ডলার ভাঙ্গিয়ে কয়েন নিয়ে চলে গেলাম স্লট মেশিনের সারিতে। এই ক্যাসিনোটিও বেশ বড়, তবে ট্রাম্প তাজমহলের মতো নয়– তাজের তুলনায় এর জৌলুসও কিছু কম।

আমাকে সাড়ে চারটার মধ্যে খেলা শেষ করে ফিরতে হবে বাস ধরতে। মাঝে মাঝে বুক পকেটে রাখা টিকিটে হাত দিয়ে সেটি দেখি, যাতে খেলার ঘোরে আবার সময় ভুলে না যাই। ঐ সময়ের মধ্যে যদি হেরে যাই তো কথাই নেই, যদি জিতে যাই তাহলেই ভয়– তখন জয়ের লোভে সময়ের জ্ঞান লোপ পেতে পারে। কিন্তু না, জেতার কোনো লক্ষণই নেই। কিছু আসে– আবার চলে যায়।

এভাবে চলতে চলতে একটা খুব আশ্চর্য ঘটনা গল্পের শেষ মুহূর্তে এসে। তখন আমার হাতে আর মাত্র একটি কোয়ার্টার অবশিষ্ট আছে। অর্থাৎ পঁচিশ সেন্ট। সময়ও শেষ। চারটা পঁচিশ হয়ে গেছে। একবার ভাবছি একটা কোয়ার্টার থাক। একেবারে খালি পকেট হয়ে যাবো? আবার ভাবছি একটা কোয়ার্টার রেখে দিয়েই বা কী হবে? তখন কোয়ার্টারটি ঢুকিয়ে দিলাম মেশিনের ভিতরে। তারপর চোখ বন্ধ করে স্লট মেশিনের হাতল ধরে দিলাম শেষ টান। উঠে পড়তে যাবো– ঠিক তখনই শুরু হলো মুদ্রা-বৃষ্টি। টুংটাং আওয়াজ করে উইজ্যা মাছের মতো ধবধবে ধাবত কোয়ার্টারগুলো মেশিনের পেট থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। শব্দ শুনে আমার মেশিনের কাছে কৌতূহলী জুয়াড়ীদের ভিড় জমে গেল। এক কোয়ার্টারের বিনিময়ে আমি পেলাম একশ কোয়ার্টার।

আর দেরী করিনি– ডেভিসের হাতে যে ভিক্ষাপাত্রটি দেখেছিলাম, সেটি ছিল এই ক্যাসিনোর। আমিও ঐরকমের একটি পাত্র এনে তার মধ্যে একশ'টি কোয়ার্টার (পঁচিশ ডলার) ভরে নিয়ে বিজয়ী বীরের মতো বেরিয়ে এলাম ট্রাম্প প্লাজার ভিতর থেকে।

আমেরিকায় এত ক্ষুদ্র বিজয়ীর দিকে কেউ ফিরে তাকায় না, কিন্তু আমার মনে হলো সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রায় দৌড়াতে আমি বাস স্টেশনে পৌঁছলাম। ভালো করে বসার আগেই বাস ছেড়ে দিল। বাস ছাড়ার পর আমি আমার লাল ঝোলার ভিতর থেকে ভিক্ষাপাত্রটি বের করলাম। পাশের যাত্রীদের চোখের সামনেই আমি ভালো করে

গুনে দেখলাম ঠিক ঠিক একশটি কোয়ার্টারই আছে। একটিও কম বা বেশি নেই। আমেরিকার কম্পিউটার কখনও ভুল করে না। অন্তত দেবার সময় তো নয়ই।

বাসটি ছিল বিরতিহীন। সন্ধা সাড়ে ছয়টার মধ্যেই আমি নিউ জার্সির নিউ ব্রানসউইক স্টপে নেমে গেলাম। দুই কোয়ার্টার খরচ করে ফোন করলাম নবীকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নবী চলে এলো তাঁর বিখ্যাত কেডিলাক গাড়িটি নিয়ে। নবী আসতেই আমি নবীকে বললাম– এই নিন আপনার পঁচিশ ডলার। এখানে অবশ্য আটানব্বই কোয়ার্টার আছে– দুই কোয়ার্টার আমি খরচ করেছি আপনাকে ফোন করার জন্য।

খুশিতে নবী আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বলল, আটলান্টিক সিটির স্যুভেনির হিসেবে এগুলো আপনি সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যান। আপনি যে ভালোয় ভালোয় ফিরতে পেরেছেন তাতেই আমি খুশি। আপনি আমাদের যা চিন্তায় ফেলেছিলেন।

আমার তখন ডক্টর আমিন ও ইরানীর কথা মনে পড়লো। মনে হলো কতদিন আমি ওদের দেখি না। নবীকে বললাম, একটু দাঁড়ান, আমি ওদের বাসায় ফোন করে সুখবরটা দিই।

নবী বললো, ওরা তো অনুষ্ঠানে আসবেই–খুশির খবরটা তখনই দেওয়া যাবে।

সে দিন রাতে তারিক আলী মিলিয়া আলীর বাসভবনে কবিকে নিয়ে দারুন আড্ডা জমে উঠেছিল। কবি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অনেক গল্প করলেন, সঙ্গে স্বরচিত কবিতা পাঠ। মাঝে মাঝে মিলিয়া আলীর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত। তারিক আলীর কণ্ঠে পুরানো দিনের গান। আমরা প্রাণভড়ে একটি সুন্দর আড্ডা উপভোগ করলাম। পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী ভাই বোনেরা তুলনামূলকভাবে এ তরুণ উদ্দীয়মান কবি নির্মলেন্দুর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন।

রুহুল আমিন এবং ইরানী আমিন কবি নির্মেলেন্দু গুণের কাছে আগের দিন আটলন্টিক সিটিতে ইচ্ছাশক্তি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছিলেন সেটা সে রাতে কেও জানতে পারল না।

জাহানারা ইমাম নিউর্জাসি এবং নিউইয়র্কে আমাদের তিনটি অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন। আমাদের সংস্পর্শে এসে আমাদের কর্মকাণ্ডে দেখে তিনি উপলব্ধি করেন প্রবাসী সকল বাঙ্গালী বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করতে চান। প্রতিনিয়ত মাতৃভূমির জন্যে তাদের প্রাণ কাঁদে।

তিনি তার এ উপলব্ধি প্রবাসের দিনলিপি গ্রন্থের ৯১ পাতায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

১৮ জুলাই ১৯৯১

দেশে ফেরার সময় ঘনিয়ে আসছে। ২২ জুলাই মিশিগান ছাড়ব লণ্ডনের পথে। লন্ডনে থাকব নয়দিন। সেখানে ভাইরা আছে, বোনের মেয়ে আছে, আরো আছে দীর্ঘদিনের বন্ধু বান্ধবরা।

আমেরিকার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছি। ডাক্তাররা সবাই এবছরের মতো শেষবার দেখে দিয়েছেন আমায়। আপাতত সব ঠিকঠাক আছে। অবশ্য আর্থ্রাইটিস সহ। ওটা যাবার নয়। ওর জন্য রোজ দুবেলা ওষুধ খেতে হয়।

নিউজার্সী বাংলাদেশ এসোসিয়েশন বাংলাদেশের সাইক্লোনের জন্য ত্রাণ তহবিল তুলেছিলেন। ওঁরা সমস্ত টাকা এক জায়গায় পাঠাননি। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ফাণ্ডে দিয়েছিলেন একটা মোটা অঙ্ক। আরো তিনচারটে প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করে দেবেন। আমি মে মাসে ফেরদৌস আলী ও নূরুন নবীকে বলেছিলাম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদেরও সাইক্লোন রিলিফ কর্মসূচি আছে। পরিষদকে কিছু টাকা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ওঁরা পরিষদকে দুহাজার ডলার ত্রাণ সাহায্য দিয়েছেন। অনুরূপ অনুরোধ আমি অ্যানআরবারের বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব মজিদখান এবং সদস্য কাজী ইহতেশাম ও মিসেস সিদ্দিকার কাছেও করেছিলাম। ওঁরাও মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে মহিলা পরিষদের সাইক্লোন রিলিফ কর্মসূচির জন্য আড়াই হাজার ডলার ডোনেশান দিয়েছেন।

বিদেশে বসবাসকারী বাঙালীর প্রাণ দেশের জন্য অহরহই কাঁদে। দেশে একটা কিছু হলে তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন। এবার দেখলাম দেশে সাইক্লোন হবার পর আমেরিকার সমস্ত অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালীদের মধ্যে ত্রাণ তহবিল তোলার কি অমানুষিক প্রচেষ্টা কাজ করেছে। হাজার হাজার ডলার তাঁরা ডোনেশান তুলেছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে পাঠিয়েছেন। এখনো পাঠাচ্ছেন।

'বিশ বছর পর'

স্বাধীনতার বিশ বছরে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে? এ সব বিষয়ের উপর একটি সমীক্ষা হওয়া উচিৎ।

তাই আমি এই বিষয়ের উপর একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। মুক্তিযুদ্ধের বুদ্ধিজীবী পক্ষের যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করছেন, লেখালেখি করেন, জনমত তৈরি করেন এমন কয়েকজনের লেখা অর্ন্তভূক্ত করা হবে। তৎকালীন নিউ জার্সির বাসিন্দা জাফর ইকবাল এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। তিনি বইটি সম্পাদনা করতে রাজী হলেন। বই এর নামকরণ করলেন বিশ বছর পর।

পরিকল্পনা হলো, আমি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনি, আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করব লেখা দেওয়ার জন্য। সাজ্জাদ চৌধুরী প্রতিশ্রুতি দিলেন মুক্তিযুদ্ধের উপর দুস্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহ করবেন।

আমি প্রথমে শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে চিঠি পাঠালাম লেখা দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে। এ ছাড়া যোগাযোগ করলাম অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, হায়াৎ মাহমুদ, কাদের সিদ্দিকী, হুমায়ূন আহমেদ, ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ড. রেজাউল হক খন্দকার, ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপিকা সানজিদা খাতুন, কবি নির্মলেন্দু গুণ, অধ্যাপক এনায়েতুর রহিম, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এ ছাড়া ড. জাফর ইকবাল এবং আমার লেখা অর্ন্তভুক্ত থাকবার সিদ্ধান্ত হলো। আমি সবাইকে চিঠি ছাড়াও টেলিফোনে তাড়া দিতে শুরু করলাম। লেখা আসতে শুরু করল। কিন্তু জাহানারা ইমাম, যাঁর লেখা সবার আগে আশা করছিলাম, তাঁর লেখার অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম। ভাবলাম তিনি হয়তো অসুস্থ। তাই লেখা পাঠাতে দেরী হচ্ছে।

অধৈর্য হয়ে একদিন ফোন করলাম জিজ্ঞেস করলাম খালাম্মা আমাদের বিশ বছর পর বই এর জন্যে লেখা কবে পাঠাবেন। তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। কোন বই এর কথা বলছ। কিসের লেখা। আমি বললাম– খালাম্মা আমার চিঠি

পান নি? উনি উত্তরে বললেন, না আমি তোমার কোন চিঠি পাই নি। আমি আমাদের বিশ বছর পর বইটির কথা বললাম এবং লেখাটি দ্রুত পাঠাতে অনুরোধ করলাম।

খালাম্মা-লেখাটি দ্রুতই পাঠিয়েছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনের ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে। তৎকালীন বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন জাতিসংঘের স্থায়ী মিশনে মহিউদ্দীন আহমেদ। জনাব আহমেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৭১ যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে তিনিই প্রথম ইউরোপে বাঙ্গালি কূটনৈতিক যিনি বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানের দূতাবাসের চাকুরী ত্যাগ করেন। ইউরোপে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করেন। পরে আরও অনেক বাঙ্গালি কূটনৈতিক মহিউদ্দীন আহমদকে অনুসরণ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

মহিউদ্দীন আহমেদ নিউ ইয়র্কে এসেই আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি সাধারণত আজ অবাধ আমলাদের সাথে তোষামুদি করতে পছন্দ করি না। উপযাচক হয়ে যোগাযোগ করিনা। মহিউদ্দীন ভাই ছিলেন ব্যক্তিক্রম। ওনার মুক্তিযুদ্ধের অবদানের কথা শুনে আমি যোগাযোগ বৃদ্ধি করি এবং অল্পসময়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে সময় স্থায়ী প্রতিনিধি পদে কেউ ছিল না। তাই মহিউদ্দীন ভাই ভারপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন। অর্থাৎ ওনার উপরে নিউ ইয়র্কে মিশনে কোন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিল না।

মহিউদ্দীন ভাই জাহানারা ইমামের একজন ভক্ত ছিলেন। খালাম্মার একাত্তরের দিনগুলি বই এর ইংরেজী অনুবাদ Of Blood and Fire করতে মহিউদ্দীন ভাই তাঁর সহকর্মী রাষ্ট্রদূত মুস্তাফিজুর রহমানকে রাজি করিয়েছিলেন। সে কারণে খালাম্মার সাথে মহিউদ্দীন ভাই এর সাথে জাহানারা ইমামের আস্থাজনক সম্পর্ক ছিল। মহিউদ্দীন আহমদের মাধ্যমে ডিপ্লমেটিক ব্যাগ লেখা পাঠানো সহজ হয়েছিল। পরবর্তী সময় যখন জাহানারা ইমাম যুদ্ধপরাধীদের বিচারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর পক্ষে আন্দোলনরত ছিলাম। তখন জাহানারা ইমামের পাঠানো প্রচারপত্র পোস্টার ও অন্যান্য জিনিস পত্র নিয়মিত আমাকে পাঠাতেন মিশনের ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে। আমি কে নো কিছু পাঠানোর দরকার হলে মহিউদ্দীন ভাই এর মাধ্যমে পাঠাতাম। রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দীন নেপথ্য থেকে আমাদের যুদ্ধাপরাধের আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন নানাভাবে। কথায় আছে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সব সময়ই মুক্তিযোদ্ধা। মহিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন চিরকালের মুক্তিযোদ্ধা। শুনেছি জাহানারা ইমাম ও আমার সাথে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দীনকে নিউইয়র্কের জাতিসংঘ মিশন থেকে প্রথমে প্রত্যাহার করা হয়। পরে খালেদা জিয়ার সরকার মহিউদ্দীন আহমেদকে চাকুরিচ্যুত করে অন্যায় ভাবে।

এতে মহিউদ্দীন আহমেদের শাপে বর হয়েছিল। চাকুরি হারিয়ে তিনি কলামিস্ট হলেন। খালেদা জিয়া সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে প্রতিদিন কলাম প্রকাশ হতে লাগল। রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দীন আহমেদের নূতন প্রতিভার উন্মেষ হলো। তিনি রাতারাতি প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় কলামিস্ট হয়ে উঠলেন বাংলাদেশে। ১৯৯৬ আওয়ামী লীগ সরকার মহিউদ্দীন আহমদকে চাকুরিতে পুর্নবহাল করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে অবসর জীবনে দেশের বিভিন্ন সমস্যার উপর নিয়মিত দৈনিক পত্রিকাগুলিতে কলাম লিখেছেন।

জাহানারা ইমামের লেখাটির শিরোনাম ছিল বিশ বছরের বিষ-বাস্প। তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন। তার উপর লেখাটির শিরোনাম ছিল যেন আমাদের বইটির সার সংক্ষেপ।

জাহানারা ইমাম কেন তাঁর লেখাটির শিরোনাম বিশ বছরের বিষ-বাস্প দিয়েছিলেন তাই এইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার লেখায় বইএর ১৫ পৃষ্ঠায়।

"বিশ বছর পর–এই নাম দিয়ে মুক্তি যুদ্ধের মূল্যায়ন, স্মৃতিচারণ এবং অন্যান্য তথ্য-ভিত্তিক রচনা দিয়ে একটি বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উদ্যোক্তরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন-বিশ বছর পর' এই বিষয়ের উপর একটি লেখা দিতে। কি লিখব আমি মুক্তিযুদ্ধের কথা? বিশ বছর পরে একটি কথাই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছ করছে-বিশ বছরের বিশ-বাষ্পে সারা দেশ এবং জাতি আজ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

আমার কথায় কি খুব বেশি হতাশা প্রকাশ পেল? সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের পর বাংলাদেশ যখন প্রথম নির্বাচন করতে যাচ্ছে, তখন বি.এন.পি. সরকার কর্তৃক মনোয়নপ্রাপ্ত জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার ছিলেন বিধায়, জাতীয় ঐক্যমতের প্রার্থী বলে, বিচারপরিত বদরুল হায়দার চৌধুরীকে সকল বিরোধীদল দাঁড় করিয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সপক্ষের ব্যক্তি বলে ঘোষিত সেই বদরুল হায়দার চৌধুরী কি করলেন? তিনি একাত্তরের ঘাতক নয়মাস ব্যাপী বাঙ্গালি নিধন ও বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়নকারী গোলাম আযমের বাস ভবনে গেলেন দোয়া চাইতে। একটা জাতির জন্য এর চাইতে আত্মঅবমাননাকারী ঘটনা আর কি হতে পারে? জামাতে ইসলাম এখন একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাদের কুড়িটা ভোট যদি এতই মূল্যবান, তাহলে সেই ভোটের এম.পি. দের কাছে গেলেন না কেন? সেটাই বরং শোভন হতো। জামাতে ইসলামের যে অঘোষিত আমীর গোলাম আযম নাগরিকত্ব-হীনতার জন্য জনসমক্ষে আসতে পারছেন না, প্রকাশ্যে আমীর হতে পারছেন না এত বছরের গণ প্রতিবাদের মুখে যিনি নাগরিকত্ব পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই গোলাম আযমের কাছে গিয়ে জাতীয় ঐক্যমতের প্রার্থী বাঙালি

জাতীয়তাবাদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মুলেই কুঠরাঘাত করলেন। এই ঘটনার পর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের শক্তি বলে কথিত সুবৃহৎ রাজনৈতিক (এবং বিরোধী) দল আওয়ামী লীগ যদি বদরুল হায়দার চৌধুরীর উপর থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে ঘোষণা দিতেন, তাহলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মুখ রক্ষা হতো। আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের অন্যান্য বিরোধী দল গুলিও তা করলেন না। বরং আরো কি করলেন? রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যেহেতু দলাদলি ভোটাভোটি হয়েছে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের সময় তাই সকল দল 'একমত' হয়ে 'সর্বসম্মতিক্রমে' যাঁকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করলেন, তিনি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ছয়বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন। এর পরও কি নিজের মুখে নিজেই আগুন ধরিয়ে পুড়ে মরতে ইচ্ছে হয় না?

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসকের পতনের পর মনের মধ্যে নতুন আশা মুকুলিত হয়েছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণও জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই যে সব আলামত দেখা যাচ্ছে, তাতে একটা সত্য খুব অভ্রান্তভাবে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তা'হলো একাত্তরের ঘৃণিত ঘাতকবাহিনী জামাতে ইসলামী বাংলাদেশে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল হিসাবে ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। যে জাতি স্বাধীনতার চেতনার স্বপক্ষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তিরিশলাখ শহীদের রক্ত, অগণিত মা বোনের সম্ভ্রমহানির গ-ানি, এবং মাইলের পর মাইল বাংলার পোড়ামাটির ক্ষতির পরিবর্তে স্বাধীনতা এনেছিল, সেই জাতির জন্য এটা মস্তবড়ো কলংকের কথা যে, একাত্তরের ঘাতক, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র আজ স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের বুকের উপর চেপে বসে আছে। কি করে সম্ভব হলো এটা? এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নিজেদেরই দোষে। একথা আলোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বিশ বছর আগে।"

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখাটি পেতে দেরী হচ্ছিল। সব লেখা পেয়েছি। কিন্তু ওনাকে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। সাপ্তাহিক বাঙ্গালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি অধ্যাপক চৌধুরীর পরিচিত এবং সাপ্তাহিক বাঙ্গালীর উপদেষ্টা। কৌশিক আহমদে লেখাটি শুধু সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। যেহেতু সময় স্বল্প তিনি লেখাটি টাইপ করে বইএর জন্যে পাঠিয়ে ছিলেন।

সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা টাইপ করাও ছিল এক সমস্যা। পেশাগত বাংলা টাইপিস্ট ছিল না বললেই চলে। সে সময় সাপ্তাহিক প্রবাসী, ঠিকানা এবং বাঙ্গালী তাদের নিজস্ব বাংলা টাইপিস্ট দিয়ে পত্রিকায় বের করত। এর বাইরে কোনো টাইপিস্ট এর কথা আমাদের জানা ছিল না। ড. জাফর ইকবাল অসাধ্য সাধন

করলেন। তিনি শুধু সম্পাদনার দায়িত্বই নিলেন না। পুরা বইটি বাংলা টাইপ করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তাও আবার নিজের আবিস্কৃত বাংলা ফন্ট দিয়ে, যা তিনি নিজ কম্পিউটারে তৈরি করেছিলেন। সে সময় ইন্টারনেটে বাংলা ফন্ট পাওয়া যেত না। বাংলা ফন্ট যা উদ্ভাবিত হয়েছিল তা ব্যক্তিগত ভাবে উদ্ভাবকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হতো। জাফরের বাংলা ফন্টের কথা জানাজানি হয়ে গেলে অনেকের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে শুরু করে। জাফর তাদের সবাইকে বিনা পয়সায় বাংলা ফন্ট বিতরণ করতো।

বিশ বছর পর বই এর লেখা টাইপ করতে আর একজন বিশেষ ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। তিনি জাফর ইকবালের মা আয়েশা ফয়েজ। তিনি সে সময় জাফরের পরিবারের সাথে নিউ জার্সিতে অবস্থান করছিলেন। জাফরের মাকে আমি খালাম্মা বলতাম। খালাম্মার বাংলা টাইপ শেখার ইতিহাস অনেকেই জানেন না। খালাম্মার স্বামী ফয়জুর রহমান আহমেদ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তিনি একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। খালাম্মা যুদ্ধের পর হুমায়ুন, জাফর এবং অন্যান্য ছেলে মেয়ে নিয়ে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। হুমায়ুন, জাফর সহ সব ছেলে মেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের ছাত্র ছাত্রী। সে সময় তিনি বাংলা টাইপ শিখেন এবং ঘরে বসে বাংলা টাইপ করে উপরি কিছু আয় করতেন। সেটা সে দুর্দিনে অনেক সাহায্য করেছিল খালাম্মাকে তাঁর সংসারকে সামনে এগিয়ে নিতে।

জাফরের বাসায় একদিন খালাম্মা আমার লেখার উপর একটি প্রশ্ন করলেন। নবী, তোমার লেখায় যে বিশ্বাসঘাতক রাজাকারের কথা লিখেছ যুদ্ধের পর তার কী বিচার হয়েছিল? জাফর জানালো, নবী-ভাই, আপনার লেখাটি কিন্তু মা টাইপ করেছে। আমি যখন অফিসে যাই, মা বাসায় কম্পিউটারে আপনার লেখাটি টাইপ করেছিলেন। খালাম্মার টাইপ শেখার পিছনের কারণও জেনে মর্মাহত হলাম। কিভাবে শহীদ পরিবারের সদস্যরা স্বাধীন বাংলাদেশে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করেছেন তার একটি উদাহরণ হুমায়ুন-জাফর ইকবালের মা। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজাকার আলবদর হয়েছে মন্ত্রী, এমপি, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিল সাজ্জাদ চৌধুরী। নিউইয়র্কে ছাপাখানা তার পরিচিত। এ ছাড়া সে আরও দায়িত্ব নিল বইএর কভার তৈরী ও ঐতিহাসিক ও দুর্লভ ছবি সংগ্রহ করা। এ সবের জন্যে মোট পাঁচ হাজার ডলার লাগবে বলে জানাল। আমি অগ্রিম পরিশোধ করে দিলাম। আমার বাংলাদেশের রওনা হবার এক সপ্তাহে পূর্বে পাঁচ হাজার কপি বই সাজ্জাদ আমার বাসায় পৌছে দিবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ যায়। বই এর কোনো খোঁজ নেই। আগামী সপ্তাহে আসবে বলে আশ্বাস দিয়েই চললো। এদিকে সপরিবারে আমরা মোট চার জন, আমি, বকুল ও ছেলে বনি এবং আদনানের

বিমানের টিকেট কাটা হয়েছে। তার উপর রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধতার ছুটি। ডিসেম্বর জানুয়ারি মিলে মোট এক মাসের ছুটি নিয়েছি। তাই বইয়ের জন্যে তারিখ পিছাতেও পারছি না। অনেক রাগারাগি করার পর সাজ্জাদ বিমান বন্দরে মোট ৫০টি বই পৌছে দিবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। বিমানের লাগেজের একটিতে ৫০টি বইএর জন্যে জায়গা খালি রাখা হলো। উল্লেখ সাজ্জাদ বই এর প্রচ্ছদ দিতে পারে নাই। জাফর ইকবাল বাধ্য হয়ে নিজেই প্রচ্ছদ অংকন করে। যাই হোক সাজ্জাদ বিমান বন্দরে মাত্র এক কপি বই নিয়ে হাজির। রাগে মনে মনে জলছিলাম। কিন্তু ছেলেদের সম্মুখে ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম কেন হলো। সাজ্জাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। সে আবার প্রতিজ্ঞা করল ঢাকা পৌছাবার কয়েক দিনের মধ্যে একপ্রেস মেইলে কমপক্ষে ২৫ কপি বই ঢাকাতে পাঠাবে। ঢাকা পৌছানের পর প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে এক কপি বইও সাজ্জাদ পাঠায় নাই। পরে জানতে পেরেছিলাম বই এর জন্যে ছবি সংগ্রহ এর খাতে যে অর্থ নিয়েছিল, তার একটি পয়সাই কাউকে দেয় না। বইএর ছবি গুলি বিনা পয়সা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে যা - যে কোনো ব্যক্তির জন্য সম্ভব।

সাজ্জাদের এই অসৎ কর্মকাণ্ডের ঘটনা এই জন্যে উল্লেখ করলাম যে ভবিষ্যতে আমার মতো আর কেউ যেন এ রকম প্রতারণার শিকার না হন। বাংলাদেশের জন্য প্রাণ কাঁদে। দায়বদ্ধতা থেকে বাংলাদেশের জন্যে যে কোনো প্রকল্পে আমি উদার মনে সায় দেই। অনেক সময় লাফিয়ে পড়ি। পরে অন্য মানুষের প্রতারণার শিকার হই।

১৯৯১ এর ডিসেম্বরে জাহানারা ইমাম চিকিৎসার জন্যে মিশিনগানে ছেলে জামীর বাসায় অবস্থান করছিলেন। ঢাকা রওনা হবার আগে ওনাকে ফোন করলাম, কবে ঢাকা আসবেন? আমি ওনার লেখা সম্মিলিত আমাদের বই বিশ বছর পর প্রকাশের কথা জানালাম। আরও জানালাম যে আমি ঢাকাতে বই এর একটি প্রকাশনা উৎসব করব। তিনি কি আসতে পারবেন? উত্তরে জানালেন তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না। ঢাকা ফেরার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে চিকিৎসার অগ্রগতি এবং ডাক্তারের পরামর্শের উপর। জাহানারা খালাম্মার দোওয়া চেয়ে ঢাকা পথে বিমানে উঠলাম।

অনেক দিনের পর দেশে এসেছি। প্রথম কিছু দিন আত্মীয়-স্বজনের দেখা সাক্ষাতে কেটেগেল। ইতিমধ্যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী পাসপোর্টধারী গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামীর আমির নির্বাচিত করা হয়েছে। তখন বাংলাদেশের পার্লামেন্টে ইসলামী দলের সদস্য সংখ্য ২০ জন। বাংলাদেশ পার্লামেন্ট দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। জামাতের বিশজন সাংসদ সদস্যের নেতা পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম। অর্থাৎ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ৬.৬ শতাংশের মালিক পাকিস্তানী নাগরিক এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম। একজন

মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি ভেবেছিলাম এ সংবাদে সারা বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। ঢাকা শহরে জঙ্গী মিছিল বের হবে। রাতে জনতার মশাল মিছিল নামবে রাজপথে। জামাতের এ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড়ে জন জীবন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্ত আমার আশা নিরাশায় পরিণত হলো। পত্র পত্রিকায় দু একটি প্রতিবাদের মিছিলের ছবি দেখলাম। মাত্র কয়েকশত জনতা। কিছু কিছু সংগঠন গোলাম আযমের আমীর নির্বাচনের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছে।

এক সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে গেলাম। দেখি আওয়ামী লীগের কি কর্মসূচি। তাদের কি চিন্তা ধারা এই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। খুব সম্ভব এটাই আমার প্রথম আওয়ামী লীগের কেন্দ্রয়ী অফিসে যাওয়া। বেশ কিছু নেতা কর্মীদের আনাগোনা। কিন্তু কাউকে চিনতে পারলাম না। সেই ১৯৭৫ থেকে বিদেশে। নতুন নেতা কর্মীদের সাথে পরিচয় নেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ উপস্থিত আছেন কি। উত্তরে জানতে পারলাম সভানেত্রীর অফিসে কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা রয়েছে। হাজির হলাম সেখানে। দেখা পেলাম আব্দুল সামাদ আজাদ ও দলের সেক্রেটারি আব্দুল জলিল ভাইকে। ওনারা দুজনেই পূর্ব পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অনেক দিন দেখা নেই। তাই পুনরায় পরিচয় জানালাম। ওনারা দুজনে অন্যান্যদেরকে নিয়ে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন। সে দিনের পত্রিকাতে আওয়ামী লীগের বিবৃতি খুব ফলাও করেছে জাপা হয়েছে। তা নিয়ে সবাই আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করছেন। জলিল ভাই এর কথা শুনেছি তিনি পোশাকে একজন সৌখিন রাজনীতিবিদ যিনি সাদা পোশাক পছন্দ করেন। তা স্বচক্ষে দেখলাম। জলিল ভাই সাদা সুট পরেছেন। তার সাথে ম্যাচ করে ঝকঝকে সাদা জুতা ও মোজা পড়েছেন। জলিল ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম আওয়ামী লীগের প্রতিবাদের কর্মসূচি কী। মিটিং মিছিল এর বড় কর্মসূচি আছে কি। সামাদ ভাই বললেন, নেত্রী এখন ব্রুনাই আছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তখন তাঁর ছোটবোন রেহানার অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার তদারক করতে বেশ কিছুদিন যাবৎ ব্রুনাইতে অবস্থান করছিলেন। সামাদ ভাই জানালেন আওয়ামী লীগ অবশ্যই বড় কর্মসূচি দিবে। তবে সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর। আমি এখানেও নিরাশ হয়ে বাসায় ফিরলাম।

জানুয়ারি ১৯৯২ এর ১৩ তারিখে বিশ বছর পর বই এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম। ভাবছিলাম এতদিন পরে দেশে ফিরেছি। কাউকে চিনি না বললেই চলে। কোথায় কিভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। এ নিয়ে আমার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করছিলাম। সে বলল, চল তোমাকে আমার এক পরিচিত বন্ধুর কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমাকে বাংলা একাডেমিতে নেওয়া হলো। তৎকালীন একাডেমির ডিরেক্টর লেখক এবং গবেষক রশিদ হায়দারের কক্ষে উপস্থিত হলাম। তার সাথে পরিচয়ের পর আমার

বন্ধু বললেন, ড. নবী তার প্রকাশিত বইয়ের একটি প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করতে চায়। তিনি কি কোন ভাবে সাহায্য করতে পারবেন? আমার এবং বই এর সম্পর্ক কিছু তথ্য জানতে চাইলেন। শুনে তিনি বললেন এটা কোনো সমস্যাই না। প্রথমেই বাংলা একাডেমির ক্যালেন্ডার দেখে জানালেন ওখানে এত অল্প সময়ের মধ্যে-আয়োজন সম্ভব নয়। মিলনায়তন কক্ষ ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস বুকড্। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তন কক্ষের কাকে যেন ফোন করে জানতে চাইলেন ওখানে কোনদিন অনুষ্ঠান করা সম্ভব কিনা। রশিদ হায়দার সাহেব জানালেন জানুয়ারি ১৩, ১৯৯২ তে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের গুলিস্তান এলাকার কেন্দ্রীয় অফিসের বিশ বছর পর বই প্রকাশ্য উৎসব করার অনুমতি পাওয়া গেছে। রশিদ হায়দার আরও জানালেন আমি যদি চাই তিনি আমার অতিথিবৃন্দকে অনুষ্ঠানের জন্যে আমন্ত্রনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমি বললাম, প্লিজ, যদি সব ব্যবস্থা করতে পারেন আমি খুব খুশি হব।

রশিদ হায়দার বললেন, দেখুন, আমরা প্রতিনিয়ত এ রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। ডাক বিভাগের উপর ভরসা করা খুবই রিকস্। আমন্ত্রণ পাঠাবেন, তা সময়মতো পৌছবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। তাই অতিথিবৃন্দ যারা এই ধরনের আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণের আগ্রহ আছে, আমাদের কাছে তাঁদের একটি লিস্ট আছে। আমরা আমন্ত্রণপত্র একজন বিশস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে হাতে হাতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের বাসায় পৌছিয়ে দেই। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আবারও অনুরোধ জানালাম আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্যে। যেইকথা সেই কাজ। রশিদ হায়দার আমন্ত্রণ পত্র লিখে টাইপ করে আমাকে দেখালেন। যে কর্মচারী এগুলো বিতরণ করবেন তাকে আমি কিছু বখশিস দিলাম।

রশিদ হায়দারের কাছে এ রকম সাহায্য পাব তা ভাবতেও পারি না। উনি সত্যি একজন সজ্জন এবং বন্ধুবৎসল ব্যক্তি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনেক লেখালেখি করেছেন। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ড. জাফর ইকবাল একজন শহীদের সন্তান। তাই হয়তো আমাদের এরই প্রকাশনা উৎসবের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বই এর উপর বিজ্ঞ অলোচকবৃন্দের আমন্ত্রণের ভার আমি নিজেই নিলাম।

রশিদ হায়দারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে নিচে নামতেই দেখা হল আর একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে। গাড়িতে উঠতে যাব, এমন সময় শুনতে পেলাম আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। পিছন তাকিয়ে দেখি একজন উচ্চ স্বরে বলছেন, নবী ভাই না? কবে এলেন? আমি ওনার দিকে তাকিয়ে সহসা চিনতে পারলাম না। কিন্তু কণ্ঠস্বর অতি পরিচিত। মুহূর্তেই চিনতে পারলাম । ছফা ভাই না? কেমন আছেন? পা বাড়িয়ে আমরা আলিঙ্গন করলাম।

লেখক গবেষক আহমদ ছফা। উনাকে শেষ দেখেছিলাম খুব সম্ভব ১৯৭৪

সালে। শরীরের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারি নাই। মনে হলো তিনি অনেক শুকিয়েছেন, আরও কালো হয়েছেন। কিন্তু চোখ দুটি কালো মুখের উপর আগের চেয়ে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর চিনতে একটুও ভুল হয় নি।

ছফা ভাই ও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে নির্মিত হলে কিছুদিন ছিলাম। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের লেকচারার। ছফা ভাই বাংলা একাডেমিতে কর্মরত রিসার্চ ফেলো। আন্তর্জাতিক হলের কিছু কিছু রুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলার শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ছিল। সে নিয়মে আমি, ছফা ভাই এবং আমাদের মতো আরও কয়েক জন্য সেখানে থাকতাম।

কুশলাদি বিনিময়ের পর পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। ছফা ভাই বললেন, আন্তর্জাতিক হলের সেই পুরানো দিনের কথা কি মনে আছে? ডাইনিং হলের আড্ডা? আমি বললাম, সে পুরানোর দিনের কথা কি ভোলা যায়? স্বরণ করিয়ে দিলাম আমাদের মাঝে কখনো কখনো তুমুল বির্তকের কথা। আমি মুজিববাদী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অন্ধ ভক্ত বলে ছফা ভাই কর্তৃক আখ্যায়িত হয়েছি। উত্তরে ছফা ভাইকে দার্শনিক কিন্তু অতিবাম বলে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু আলোচনা শেষে উনার দার্শনিক ও জ্ঞান গর্ব মন্তব্যের প্রতি আমি সব সময় শ্রদ্ধাশীল ছিলাম।

ছফা ভাই বললেন, নবী ভাই, মনে আছে কি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমাদের সেই বিশেষ ক্যাম্পেইনের কথা। আমি বললাম সেকি ভোলা যায়।

একদিনে ডাইনিং হলে ডিনার খাচ্ছিলাম। ছফা ভাই যোগ দিলেন। খেতে খেতে বললেন। নবী ভাই, চলুন আমরা একটি কাজ করি। আমাদের উভয়ের প্রিয় ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদের জন্যে একটু ক্যাম্পেইন করি। কি কাজ করতে হবে খোলাসা করে বলতে বললাম। তিনি বললেন, হুমায়ূন একটি উপন্যাস লিখেছেন। নাম নন্দিত নরকে। একটি অসাধারণ উপন্যাস। চারিদিকে প্রশংসা। আপনি কি পড়েছেন? আমি অপ্রস্তুত হয়ে জানালাম, না এখনো পড়া হয় নি?

হুমায়ূন আমার ব্যাচমেট। সে কেমিস্ট্রিতে এবং আমি বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়তাম। যুদ্ধের পর আমাদের মধ্যে সক্ষতা বাড়ে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। হুমায়ূন একজন শহীদ এর সন্তান। পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। হুমায়ুন এম এসসি শেষ করে ময়মনসিংহ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে আর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করি। হুমায়ুনের বইএর কথা মুখেমুখে শুনেছি। কিন্তু এখনো পড়া হয় নাই।

আমি ছফা ভাইকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। হুমায়ূনের জন্যে আমি কি করতে পারি। তিনি জানালেন, হুমায়ুনের বইটি তিনি বাংলা একাডেমির পুরস্কারের জন্য জমা দিয়েছেন। কিন্তু একাডেমির সদস্যদের মধ্যে লবি না করলে পুরস্কারের

কোনো আশা নেই। তিনি বললেন, চলুন আমরা দুজনে মিলে ঢাকায় অবস্থিত একাডেমির সদস্যদের বাসায় বাসায় যাই এবং হুমায়ুনের পক্ষে পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ করি।

আমি বললাম, একাজের জন্য আপনি একাই যথেষ্ট। আপনি একাধারে লেখক এবং বাংলা ভাষা সাহিত্যের উপর গবেষক। আপনার মতামতের উপর একাডেমির সদস্যবৃন্দ নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিবে। আমি সাহিত্যের ছাত্র নই। বিজ্ঞানের শিক্ষক। ছফা ভাই বললেন, না, আপনাকেও কাজে লাগবে। আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার উপরে মুক্তিযোদ্ধা বাঘা সিদ্দীকীর সহযোদ্ধা। আপনাকে সবাই চিনে। অকাট্য যুক্তি। তার উপর হুমায়ূন আমার বন্ধু।

ছফা এবং আমি প্রতিদিন সন্ধের পর রিকসায় বাংলা একাডেমির সদস্যদের বাসায় গিয়ে হুমায়ূন আহমদের পুরস্কার পেতে যুক্তি তুলে ধরতাম। ছফাভাই মূলত কথা বলতেন। আমি ছিলাম একটি শো পিস। ছফা ভাই এর সঙ্গে ঘুর আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমাদের এ প্রচেষ্টার ফল কি হয়েছিল তা জানতে পারি নাই।

এভাবে পুরানো দিনের কথা রোমান্থন শেষে ছফা ভাই এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাংলা একাডেমির চত্বর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার বই এর আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানাতে ভুলি নাই।

ছফা ভাইকে আমেরিকায় আসতে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি বললেন, আমন্ত্রণ পত্র পেলে অবশ্যই আসবেন। আমন্ত্রণ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় জানালাম।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বই এর উপর আলোচনা করার জন্যে ফোনে আমন্ত্রণ জানালাম কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, জাস্টিস সোবহান, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপিকা সানজিদা খাতুন, কবি হায়াৎ মাহমুদ, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক হারুন হাবীব, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে। সবাই বই এর একটি কপি চাইলেন। সাজ্জাদ চৌধুরীর প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে সবাইকে কথা দিলাম বইটি যত তাড়াতাড়ি উনাদের হাতে পৌছে দিব।

৭ জানুয়ারি সকাল। আমার জন্যে ফোন কল। আমরা ঢাকাতে বেড়াতে গেলে বকুলের বড় বোন কমলা আপা এবং দুলাভাই করিমুল হকের বাসায় থাকি। আপা বললেন নবী তোমার ফোন। হ্যালো বলতেই শুনতে পেলাম নবী আমি খালাম্মা বলছি। গতকাল ঢাকা এসেছি। ডাক্তারের অনুমতি পেয়ে আর এক মুহূর্তে দেরী করি নাই। তোমরা কবে আমার বাসায় আসবে? কবে আমেরিকাতে ফিরে যাচ্ছ?

আমি খালাম্মা জাহানারা ইমামের কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে আত্মহারা। উনাকে

জানালাম আমাদের বই এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি জানুয়ারি ১৩ তারিখে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে। আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। আমেরিকা ফেরৎ যাবার আগে উনার বাসায় যাব বলে কথা দিলাম। আলোচনা অনুষ্ঠানের আর কে কে থাকবেন জানতে চাইলেন। আমি আমন্ত্রিত আলোচকজনের নাম জানলাম।

তিনি নাম জেনে খুশি হলেন। বললেন, তুমি উপযুক্ত ব্যাক্তিদেরকে আমন্ত্রণ করেছো। জাহানারা ইমামকে এভাবে পাব ভাবতে পারি নাই। ভেবেছিলাম তিনি চিকিৎসার জন্যে আমেরিকায় থাকবেন।

১৩ই জানুয়ারি অনেকটা আগেই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে সপরিবারে উপস্থিত হলাম। সঙ্গে কমলা আপা ও করিমুল দুলাভাই। লেখক হায়াৎ মাহমুদ সুন্দর ব্যানার বানিয়েছেন বই এর কভার দিয়ে। চেয়ার টেবিল ব্যানার সব সাজানো হয়েছে। জানতে পারলাম মিলনায়তন ভাড়ার টাকার মধ্যে ২০০ জন অতিথিদের জন্যে স্ন্যাক্সের প্যাকেট থাকবে। প্রতিটি প্যাকেটে একটি মিষ্টি, কলা ও সিঙ্গাড়া। কি সুন্দর ব্যবস্থা। অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ জানালেন তিনি অসুস্থতার জন্যে আসতে পারবেন না।

জাহানারা ইমাম এবং সানজিদা খাতুন একত্রে প্রবেশ করলেন। ছালাম বিনিময়ের পর সানজিদা আপা জানালেন, নবী, আপনার জন্যে একটু চমক রয়েছে। জানতে চাইলাম চমকটি কী। বললেন না। অপেক্ষা করতে হবে। একে একে সবাই এসে গেলেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলাম। সাজ্জাদের কথা মোতাবেক বলেছিলাম অনুষ্ঠানের আগেই বই পৌছে দিব সব আলোচকদের হাতে। উনারা বই পড়ে আলোচনা করবেন। সাজ্জাদ আবারও কথা রাখল না। আমাকে এ রকম একটি লজ্জায় ফেলে দিল। আমি কেন যে ওকে বিশ্বাস করেছিলাম ভাবতে নিজেকে খুব বোকা মনে হলো। অনুতপ্ত হচ্ছিলাম, আমি পকেটের পাচ হাজার ডলার খরচ করে এ লজ্জা কিনেছি।

বই না দেওয়ার জন্যে সবার কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমার সঙ্গে একটি কপি ছিল। সেটা সবাইকে শো এন্ড টেল এর মতো এক হাত থেকে অন্য হাতে বিতরণ করছিলাম।

কবি শামসুর রহমান সভাপতিত্ব করলেন। হারুন হাবীর সভাটির সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কবি শামসুর রাহমান, কবির চৌধুরী, জাস্টিস কে এম সোবহান, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, কাদের সিদ্দিকী ও আমি।

জাহানারা ইমাম কাশিতে ভূগছিলেন। তিনি আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন না বলেই শুরুতেই জানিয়েছিলেন। অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্র শিল্পী ড. নওজেস আলী। অনুষ্ঠান শুরু হতে যাবে তার একটু

আগে প্রায় ১০-১২ জন তরুণ তরুণী সাজাগোজ করে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তবলা। সানজিদা আপা মুচকি হেসে বলরেন, আপনাকে বলেছিলাম না চমকের কথা। এই সেই চমক। তিনি ছায়ানটের ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের অজিত রায়ের নেতৃত্বে রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সমবেত কণ্ঠে সূচনা সঙ্গীত পরিবেশনা করা হলো। সবাই উপভোগ করলেন।

সানজিদা আপাকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম । অনুষ্ঠানটি সার্থক এবং সুন্দর করার জন্যে নিজ উদ্যেগে এ রকম একটি সুন্দর চমক দেখালেন।

অনুষ্ঠানে আমি স্বাগত বক্তব্য রাখছিলাম। এমন সময় ছন্দ পতন হলো। আমার ছোট ছেলে আদনান নবীর বয়স তখন তিন বছর। অনুষ্ঠানে এসে তার মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি যখন বক্তব্য রাখছিলাম, হঠাৎ আদনানের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখতে পায় সে তার মার কোলে আর বাবা মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছে। কেঁদে উঠল বাবার কাছে যাব। তিন বছরের শিশু। তাকে কি আর বোঝানো যাবে! অগত্যা আমার কাছে এল। আমি আদনানকে কোলে নিয়ে বক্তব্য দিতে থাকলাম।

প্রসঙ্গে পাল্টিয়ে বললাম, আমরা যারা প্রবাসে বাস করি, তাদের অনেক দায়িত্ব। প্রবাসে কাজের লোক নেই। আমরা চাকরী করে জীবিকা অর্জন করি। আবার বাসা এসে আমরাই কাজের লোক। আমরা বেবী সিটার। বাবাদের কে অনেক সময় হয় দিতে সন্তানদের জন্যে। যদিও মায়েরা সন্তানদের বেশি সময় দেয়। কিন্তু বাবাদের কে সময় দিতে হয় যখন মায়েরা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই বাংলাদেশের বাবাদের চেয়ে প্রবাসে বাঙ্গালি বাবাদের সাথে ছোট সন্তানদের বন্ধন একটু দৃঢ় বটে। আমার পুরো বক্তব্যের সময় আদনান আমার কোলে থাকল। তারপর কিছুক্ষণ মঞ্চে থেকে পরে মায়ের কাছে ফিরে গেল।

বিশ বছর পর বই এর প্রকাশের কথা অংশে আমি যা লিখেছিলাম মোটামুটি তাই বললাম আমার স্বাগতিক বক্তব্যে। অবশ্য উপস্থিত সবাইকে প্রথমে ধন্যবাদ জানালাম কষ্ট করে অনুষ্ঠানে আসার জন্যে আবার ক্ষমা চাইলাম বই না দিতে পারার জন্যে। বই থেকে প্রকাশকের কথা নিম্নে সংযোগ করলাম।

"৭১ এর পঁচিশে মার্চের কালোরাত্রিতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙ্গালি জাতির উপর বর্বর ও পাশবিক আক্রমণ চালায়। বাঙালি জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার লক্ষ্যে হত্যা করে ছাত্র শিক্ষকসহ অসহায় এবং নিরীহ বাঙ্গালি, লুণ্ঠন করে আমাদের মা বোনের ইজ্জত, এবং পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করে ধ্বংস করে কল কারখানা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাঙ্গালি জাতি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

৭১ এর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতা আমরা দুজনে প্রত্যক্ষ করেছিলাম স্বচক্ষে। আমাদের একজন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১১দফা আন্দোলনের সাক্রয় কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের লাশ এবং ঢাকা

শহরের অন্যান্য ধ্বংস যজ্ঞ দেখেই প্রতিরোধের শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের অন্যতম সাথী তখন বয়সে কিশোর। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বর্বরতার কালোহাত তাকেও ছোবল মারে-তার পিতা লাঞ্ছিত হন হানাদার বাহিনীর হাতে। মুক্তিযুদ্ধের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও আমাদের দুজনের মনে দুঃস্বপ্নের মতো প্রতিনিয়ত জাগরুক।

আমরা আশা করেছিলাম ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। চির জাগরুক থাকবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু হায়! স্বাধীনতার বিশ বছর পর আজ স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিলুপ্ত। আদর্শ বিসর্জিত। মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত। সুদূর প্রবাস থেকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমরা ব্যথিত। এই হতাশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হলো মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরন করে, তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এর থেকে কোনো বিকল্প আমাদের জানা নেই।

এই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কিছু ছবি এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার উপর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনামূলক লেখার সমন্বয়ে এই বইটি প্রকাশের পরিকল্পনা করি। নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙ্গালি জাতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার এটা আমাদের একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

আমাদের এই বইটি যদি একজন নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, যদি একজন পথভ্রষ্ট মুক্তিযোদ্ধাকেও সুপথে ফিরিয়ে আনে, যদি একজন সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বাঙ্গালি বলে গর্ব অনুভব করতে,তবে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমরা মনে করব। যদি তা না হয় তবে বর্তমান বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে অবমাননা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এই বইটি আমাদের সোচ্চার প্রতিবাদ হয়ে রইল।।।

অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক এম আনিসুজ্জামান। তিনি রসিকতা করে শুরু করলেন। বই না পড়ে তো বই এর উপর আলোচনা করা যায় না। ভেবেছিলাম ড. নবী বই যখন অনুষ্ঠানের আগে দিতে পারে নাই, তবে নিশ্চয় অনুষ্ঠানস্থলে বইটি হাতে পাব। যদিও জীবনে নকল করি নি, শিক্ষক হিসাবে নকল ধরেছি, ভেবেছিলাম আজ না হয় জীবনের প্রথম নকল করব। বইটি হাতে পেয়ে মেনস্ রুমে গিয়ে দ্রুত পড়ে ফেলব। তারপর আলোচনা করব। কিন্তু সে সুযোগটিই পেলাম না। তিনি দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা করলেন বিশেষ করে গোলাম আযমের নাগরিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠালেন।

একে একে অন্যান্য আলোচকবৃন্দ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, জাস্টিস কে এম সোবহান, কাদের সিদ্দিকী, সানজিদা খাতুন আরও কয়েকজন বইএর উপর আলোচনা না করে গোলাম আযমের ইস্যুতে বক্তব্য রাখলেন। কবি শামসুর রহমান সভাপতির ভাষণে তাঁর আমেরিকায় ভ্রমণের একটু স্মৃতিচারণ করলেন। বকুল এবং আমার আতিথেয়তার কথা উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানালেন।

অবশ্যই তার আগে যারা বক্তব্য দিয়েছেন,তাদের মধ্যে যারা আমাদের আথিয়তা গ্রহণ করে ছিলেন যেমন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক সানজিদা খাতুন, হায়াৎ মাহমুদ সবাই বকুল এবং আমাকে ধন্যবাদ জানালেন আমেরিকায় আমাদের আতিথেয়তার জন্যে।

যদিও আমাদের বইএর উপর আলোচনা হলো না বিস্তারিত ভাবে, কিন্তু সে সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় গোলাম আযমের আমীর নির্বাচিত হওয়ায় সবাই এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সবাই মত প্রকাশ করলেন যে জামাতে ইসলামীর এই ধৃষ্টতা বিনা চেলেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দলমত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর মোকাবেলা এবং প্রতিকার করতে হবে। পরের দিনের সকল পত্রিকাগুলিতে হেড লাইন নিউজ ছাপানো হলো, আমেরিকায় প্রকাশিত বিশ বছর পর বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বরণ্যে বুদ্ধিজীবীগণ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের জামাতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হওয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এর প্রতিকারের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

বই এর উপর আলোচনা না হলেও আমাদের অনুষ্ঠানে এই সর্ব প্রথম প্রথমসারির বরেণ্য বুদ্ধিজিবীগনণ গোলাম আযমের বিষয়ে মত প্রকাশ করলেন। আমি এই প্রতিবাদের প্লাটফরম তৈয়ারী করে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। বৃথা যায় নাই জেনে ভালো লাগল।

অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদের পালা। আবার আমি সকল দর্শক ও আলোচকবৃন্দের কে ধন্যবাদ জানালাম। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে যারা সাহায্য করেছিলেন, রশিদ হায়দার, হারুণ হাবিব, কবি হায়াৎ মাহমুদ, সানজিদা খাতুন সবাই ধন্যবাদ জানালাম।

এই সঙ্গে আমেরিকাতে যারা বইটি প্রকাশ করতে বিভিন্ন সাহায্য করেছিলেন, ড. জাফর ইকবাল ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ড. ফেরদৌস আলী, কৌশিক আহমেদ, ড. জিনাত নবী, ড. রুহুল আমিন, নাজমুল আহসান, করিমুল হক তালুকদার, ড. ইয়াসমিন হক ও মাহমুদা আমিন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম।

জাহানারা ইমাম যদিও কাশির জন্যে বক্তব্য রাখতে পারলেন না। তিনি সম্মুখ সারিতে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানের বক্তার বক্তব্য শুনছিলেন।

মঞ্চ থেকে নেমেই দেখতে পেলাম, জাহানারা ইমাম এবং সানজিদা খাতুন দাঁড়িয়ে, আমার কাছ থেকে বিদায়ের অপেক্ষায় আছেন। আমাকে পেয়ে বললেন, আমাদেরকে কবি সুফিয়া কামালের বাসায় একটি মিটিং এ যেতে হবে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছে গত কয়েকদিন যাবৎ। আমাদের একটা কিছু করতে হবে। সেটা হতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং কোন একটি সংগঠনের মাধ্যমে। আর দেরী করতে পারছি না। আমাকে এবং বকুলকে জাহানারা খালাম্মার বাসায় যেতে বললেন ঢাকা ছাড়ার আগে। যাবার জন্যে তড়িঘড়ি করে সবাই বিদায় নিলেন সুফিয়া কামালের বাসায় যাওয়ার জন্য।

অনুষ্ঠানটি শুধু বইএর প্রকাশন উৎসব ছিল না। এটা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর স্পষ্ট প্রতিবাদের প্লাটফরমকে রূপান্তরিত হয়েছে জেনে খুব ভালো লাগল। আমার সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় ও প্রচেষ্টা যথার্থ মনে হলো।

পরবর্তী কয়েকদিন আমেরিকা ফেরার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। জাহানারা ইমামের বাসায় আর যেতে পারলাম না। ১৬ জানুয়ারি অনেকটা ভারাক্রান্ত মনে অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলাম।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি । যুক্তরাষ্ট্র শাখা

নিউ জার্সিতে ফিরে দেশের অবস্থার যথা ভাবছিলাম । গোলাম আযমের ব্যাপারে দেশে না হলে প্রবাসে আমাদের কিছু করতে হবে । আমরা অতীতে প্রবাস থেকে বাঙ্গালিরা দেশের জন্যে অনেক কিছু করেছে । ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীরা উল্লেখ যোগ্য অবদান রেখেছিল । আমরা স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধের জন্যে আন্দোলন করেছি । যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ইসুতে আমরা অবশ্যই কিছু করতে পারি ।

ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ নামক একটি সর্বদলীয় কমিটি করেছিলাম । আমাকে এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছিল । এ কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে-ছিলেন । সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ড. ইউসুফ, গজনফর আলী চৌধুরী, ফরাশত আলী-নূরুল ইসলাম আনু । আব্দুস সালাম, ফজলুর রহমান, মোসাব্বির, আবু তালেব, ফখরুল ইসলাম সহ আরো অনেক । এ কমিটির নেতৃত্বে আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছিলাম যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট । কংগ্রেস ও জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে লবি করেছিলাম । এ ছাড়াও এরশাদ যতবার আমেরিকাতে এসেছে, ততবার তার ভ্রমণ স্থলে বিভোক্ষের আয়োজন করেছিলাম । আমাদের এসব আন্দোলনের খবর বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল । আমাদের এসব কর্মকান্ড সেখানে আন্দোলনরত দেশবাসীকে তাদের স্বৈরশাসক বিরোধী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল । অবশেষে এরশাদ স্বৈরশাসনের পতন হয়েছিল । গোলাম আযম ইসুতে এ রকম একটি আন্দোলন গড়ে তোলাও সম্ভব । কারণ আমরা স্বৈরশাসক বিরোধী আন্দোলন সাফল্য অর্জন করেছিলাম । এ বিষয়ে আমি সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সহ বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বললাম । সবাই রাজী-হলেন আমরা প্রবাস থেকে গোলাম আযম সহ সকল যুদ্ধপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলন শুরু করব । সবাইকে নিয়ে একদিন বসব ।

যখন আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করছিলাম, বাংলাদেশ থেকে খবর

পেলাম ১৯ জানুয়ারি জাহানারা ইমামকে আহ্বায়ক করে গোলাম আযম ইসুতে ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ খবর পেয়ে আনন্দিত হলাম। প্রবাসের মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তি আশার আলো দেখতে পেলে। নিউ ইয়র্কে স্বতস্ফূর্তভাবে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নামে দুটি কমিটি গঠিত হলো। একটিতে আমাকে আহ্বায়ক ও ফরাশত আলীকে সদস্য সচিব, অপরটিতে কাজী-জাকারিয়া আহ্বায়ক। খুব সম্ভবত তারিক মাহবুব সদস্য সচিব।

আমরা দুএকদিনের মধ্যে ঐক্যের খাতিরে এবং বৃহত্তম স্বার্থে দুটি কমিটিকে একত্রিত করে একটি কমিটি গঠন করলাম। কাজী জাকারিয়া ও আমি যৌথ আহ্বায়ক এবং ফরাশত আলী সদস্য সচিব নির্বাচিত হলো। কাজী জাকারিয়া নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি নেতা ছিলেন। নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি। ফরাশত আলী তৎকালীন গণতন্ত্রী দলের যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এ কমিটিতে আরও ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ, ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, নূরুল ইসলাম অনু, আব্দুস সালাম, নূরুজ্জামান শাহী, মোসাব্বির, গজনফর আলী, সৈয়দ চৌধুরী, আবু তালেব, সুব্রত বিশ্বাস , রাফায়েত চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম, মোরশেদ আলম নাজমুল হক হেলাল, ফকির ইলিয়াস, মোহাম্মদ হানিফ, চন্দন, আব্দুর রহিম বাদশা, অধ্যাপক ফরিদা মজিদ সহ আরও অনেকে। শত শত ব্যক্তি কমিটিতে নাম লেখালেন।

আমি জাহানারা ইমামকে ফোন করে অভিনন্দন জানালাম ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হওয়ার জন্যে। আমি জানালাম, আমরা নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র শাখা গঠন করেছি। আমি ও কাজী-জাকারিয়া যৌথ আহ্বায়ক এবং ফরাশত আলী সদস্য সচিব। তিনি আমাদের অভিনন্দন জানালেন। তিনি জানালেন আমার বই এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান থেকে ওনারা ও অনেকে কবি সুফিয়া কামালের বাসায় যান। সেটা ছিল ১৩ই জানুয়ারি। সবাই সুফিয়া কামালকে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং সেই নবগঠিত সংগঠনের আহ্বায়ক হিসাবে সুফিয়া কামালকে নির্বাচিত করতে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানান। কবি সুফিয়া কামাল সবাইকে নিয়ে একটি নূতন সংগঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে আহ্বায়ক দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। সুফিয়া কামাল বরং জাহানারা ইমামকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করার জন্যে প্রস্তাব করেন। সবাই তা মেনে নেন।

পরে আরও অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করে ১৯ জানুয়ারী ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হয়। জাহানারা ইমাম আহ্বায়িকা এবং এতে ২৪ জানুয়ারী সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের- চেতনা-বিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের খবর বেরুল। জাহানারা ইমাম তাঁদের সাথে আলাপ

আলোচনা করে ঐক্যের খাতিরে এবং বৃহত্তম স্বার্থে দু কমিটিকে একত্রিত করে নূতন নাম দিলেন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা ঘটল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। এ নূতন সংগঠনের আহ্বায়িকা হলেন জাহানারা ইমাম এবং সদস্য সচিব হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মান্নান।

আমরা নিউ ইয়র্কে ও আমাদের কমিটির নাম পরিবর্তন করলাম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখা।

জাহানারা ইমাম জানালেন শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কাজটি নূতন সহজ ছিল না। অনেক ধৈর্য, অনেক সহনশীলতা, অনেক আলাপ আলোচনার পর এটা সম্ভব হয়েছিল। জাহানারা ইমাম তাঁর মূলধারায় চলেছি গ্রন্থে ১৫-২৩ পাতায় বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন–

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি একটি ভিন্ন ধরনের সংগঠন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অনেক নেতা-কর্মী এতে যুক্ত থাকার পরও এটা কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন নয়। এটা একটা আন্দোলন। মূলত 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চ' নামের দু'টি নির্দলীয় সংগঠনের এই 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র সূত্রপাত। পরে একে একে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্দোলনের বিভিন্ন সংস্থা, রাজনৈতিক দল, মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র নারী-সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সংগঠন। এই সংগঠনগুলো মিলিতভাবে যত মানুষের সংখ্যা শক্তি দিয়ে আন্দোলনকে শক্তি যোগাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এসেছেন অন্য জায়গা থেকে। ওই জায়গাটি হচ্ছে চুপ করে বসে থাকা অযুত-নিযুত মানুষের নীরব এলাকা। সেখান থেকেই উঠে এসেছেন অধিকাংশ। এই মানুষের কাছে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা ঘাতক গোলাম আযম ও জামাত-শিবির চক্রের তৎপরতাকে রুখতে চান। সেজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল ঐক্যের দেশের সর্বস্তরের মানুষের ঐক্য, আন্দোলন-সংগ্রামের সকল সংস্থার একতা। এই প্রয়োজন কিছুটা অর্জিত হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠনের মধ্যে।

মানুষ কি চায়, তারা কোন পথে অগ্রসর হতে আগ্রহী তা প্রতিফলিত হয় সংগঠিত হওয়ার মধ্যে-আন্দোলনের মাধ্যমে। কয়েকজন ব্যক্তির ভাবনা অনেককে যুক্ত করতে পারে। অনেকের ঐকমত্য সংগঠনের জন্ম দেয়। সংগঠন আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরানব্বইর জানুয়ারি থেকে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে একটি

আন্দোলন-বিবৃতি, অজস্র বৈঠক, সংগঠন, বহু মিছিল, অনেক জনসভা, গণআদালত, ছোটখাটো সংঘর্ষ ও হরতালের মধ্য দিয়ে। আর এই আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সংযুক্তিও খুবই ঘটনাবহুল। একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী যখন দলের আমীর ঘোষণা করলো তখন আমি দেশে ছিলাম না। আমি বিদেশে ছিলাম ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য। ৬ জানুয়ারি দেশে ফিরি। আমার অনুপস্থিতিতে আমার জন্য বাসায় কোনো না কোনো একটি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। অনেক দিনের জমে থাকা পত্রিকা পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা খবর দেখে চমকে উঠি। কি অদ্ভুত সব ঘটনা। জামাতে ইসলামী ঘাতক গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করে বসেছে। ২৯ ডিসেম্বর এই ঘাতককে আমীর ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা, সমাবেশ, মিছিল হয়েছে–এই খবরও পড়লাম। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সংগঠন ও অনেক রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদ বিবৃতিও দেখলাম এই ঘটনার নিন্দায়। সবকিছু দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। বিচলিত বোধ করলাম, ক্ষুব্ধ হলাম। একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে গোলাম আযম ও জামাতে ইসলামের পাকিস্তানীদের সমর্থন, গণহত্যায় সহযোগিতা, লুটতরাজ, ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন–ধর্ষণের কথা কখনো ভুলতে পারি নি। সব সময় চেয়েছি এই সব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক। অতীতে অনেকের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছি, কাজ করার চেষ্টা করেছি, আন্দোলন করতে চেয়েছি। ঘাতক, দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, গোলাম আযম, জামাত-শিবিরসহ এই সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে আমরা অনেকেই সোচ্চার ছিলাম। আমার মধ্যে এই ঘৃণিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল, ব্যথা ছিল, যন্ত্রণা ছিল। এখনো আছে। অনেকে বহুবার নানা ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সকলকে নিয়ে। সেসব সফল হয় নি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে। দেশে সামরিক দুঃশাসন ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোর বহুবিধ প্রশ্নে ও বিতর্কে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একতা ছিল অলীকে স্বপ্ন। জেনারেল এরশাদের দুঃশাসন এবং তার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেক জট খুলছিল, এক ধরনের ঐক্য গড়ে উঠেছিল। আবার অনেক আশা-ভরসার পেছনে পেছনে এক পা-দু'পা করে সামনে আসছিল জামাত-শিবির ঘাতক চক্র-অনেকের অগোচরে, অনেকের প্রশ্রয়ে।

স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর টেলিভিশনের পর্দায় আরেক স্বৈরাচারকে দেখলাম। ধর্মীয় স্বৈরাচারী জামাতের নেতা ঘাতক আব্বাস আলী খানের চেহারাও ভেসে উঠলো খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, রাশেদ খান মেননের পাশাপাশি। বিচিত্র সব ঘটনা। সংসদ নির্বাচনে তারা আঠারটি আসনে নির্বাচিত হলো। দেশের সাধারণ মানুষের সামনের জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য ছিল না। আমরা নূতন প্রজন্মের মানুষদের এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলতে পারি

নি। এই অপরাধের দায়িত্ব থেকে আমরা কেউ ক্ষমা পাব না।

আমি আমার ছেলে রুমীর মুক্তিযুদ্ধের সাথীদের সঙ্গে গত একুশ বছর যোগাযোগ রেখেছি। তারাও আমার সঙ্গে সব সময় সম্পর্কিত থেকেছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম দ্রুত। আলাপ করলাম, জানতে চাইলাম, কি হচ্ছে এসব? ঘাতক গোলাম আযম আজ প্রকাশ্যে জামাতের আমীর হয়ে বসলো। কি করেছেন সবাই? তারা আমাকে আশ্বস্ত করলো। কিছু উদ্যোগের কথা জানালো। স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগ হলো কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, ফতেহ আলী চৌধুরী, মিজান, মুনিরসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে। যারা বিগত সময়ে কখনো ভোলে নি মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো, দুঃসময়, আর শত্রু ঘাতক-দালালদের কথা। এরা সবাই নানা চিন্তা-ভাবনা করছিল। এদের আহ্বানে আমি ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় একটি বৈঠকে উপস্থিত হই কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের বাসায়। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সেদিন কিছু কাজে হাত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর ১১ জানুয়ারি কর্নেল নুরুজ্জামান সাহেব আমার বাসায় আসেন। তিনি বিভিন্ন পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন। কোনো একটা সাংগঠনিক অবয়বের মধ্যে কাজ করার তাগিদ দেন। তিনি বেগম সুফিয়া কামালকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের চিন্তা উত্থাপন করেন। আমরা এক সঙ্গে অতীতেও 'ফ্যাসিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী কমিটি' করেছি, জনসভা করেছি, বক্তব্য রেখেছি, মিছিলও করেছি। কাজেই এটা বুঝছিলাম আমাদের প্রাথমিক কাজটি হবে একটি সংগঠন গড়ে তোলা। দুদিন পর ১৩ জানুয়ারি আমরা বেগম সুফিয়া কামালের কাছে যাই। তাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানাই। তখন তিনি সব শুনে বললেন, 'আমার শরীর খুব খারাপ। আমি তো চলাফেরা ভালোভাবে করতে পারি না। আমি সমর্থন করবো, সহযোগিতা করবো। আপনারা জাহানারাকে আহ্বায়ক করে কমিটি করুন।' আমরা তাঁকে রাখার জন্য অনেক জোরাজুরি করলাম, বোঝাতে চাইলাম তার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তিনি জানালেন, শারীরিক কারণেই তিনি পারবেন না। আবার বললেন, 'জাহানারা আমার সঙ্গে মহিলা পরিষদে কাজকর্ম করে, ওর স্বাস্থ্য আমার চেয়ে ভালো, ও শক্ত আছে, কাজেই ও-ই হোক।'

১৩ জানুয়ারি বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে বৈঠকের পর আমরা বুঝতে পারি একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর সমর্থন পাওয়া যাবে, কিন্তু শারীরিক কারণেই তিনি এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছেন না। তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন নিয়মিতভাবে চলতে থাকে আমাদের বৈঠক। একটি-দুইটি নয় অনেক বৈঠক করতে হচ্ছিল প্রতিদিন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের এক জায়গায় দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছিল। ততদিনে আমরা সংগঠিত হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট

লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছি। একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হলো। ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। ১৯ জানুয়ারি আমরা একটি সভায় মিলিত হয়ে 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটি' গঠন করলাম। ইতিপূর্বে আমরা যে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম সেই স্বাক্ষরদাতাদের ১০১ জন এই কমিটির সদস্য হলেন। আমাকে করা হলো আহ্বায়ক। ২০ জানুয়ারি প্রায় সবক'টি দৈনিক পত্রিকায় এই কমিটি গঠনের খবর প্রকাশিত হলো। এরই মধ্যে শাহরিয়ার কবির সকলের বক্তব্যকে একসূত্রে গেঁথে একটি ঘোষণাও রচনা করে ফেললো। তীক্ষ্ম ও খুবই দৃঢ় এই ঘোষণার প্রথম স্তবকে বলা হলো:

'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত মানবেতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞের প্রধান দোসর, অগণিত মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীর দল জামাতে ইসলামী সম্প্রতি পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে তাদের আমীর বানিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর সরাসারি আক্রমণ চালিয়েছে। এই গোলাম আযম একাত্তরে জামাতে ইসলামির আমীর ছিল। বর্বর পকিস্তানী সৈন্যরা যখন সারা দেশ জুড়ে নির্বিচারে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করেছে, নির্যাতন করেছে আমাদের মা-বোনদের, তখন গোলাম আযম ও তার দল জামাতে ইসলামী তাদের শুধু অকুণ্ঠ সমর্থনই জানায় নি, নিজেরা উদ্যোগী হয়ে তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একই ধরনের অপরাধ করেছে। কুখ্যাত পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে এই গোলাম আযম ঘাতক আলবদর বাহিনী তৈরি করেছিল এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকে গোলাম আযম তার বিরোধিতা করেছে। বলেছে, ' কোনো ভালো মুসলমানই বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।' মুক্তিযোদ্ধাদের তারা বলেছে, 'দুস্কৃতকারী', 'জারজ সন্তান' আর নিজেদের বলেছে 'পাকিস্তান প্রেমিক'। এই পাকিস্তান প্রেমের কারণে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও গোলাম আযম বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে পাকিস্তানে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' গঠনের মাধ্যমে। ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার অজুহাতে পাকিস্তানের একান্ত অনুগত নাগরিক গোলাম আযম বাংলাদেশে এসে একাত্তরের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছে জামাতে ইসলামকে পুনর্গঠিত করার মাধ্যমে। একাত্তরের ঘাতকদের ঐক্যবদ্ধ করে' ৮১ সালের ২৯ মার্চ প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনের তারা সদম্ভে ঘোষণা করেছে–'১৯৭১ সালে আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি এবং একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট ঠিক ছিল না'। এই কথা বলে তারা অবিরাম হামলা চালিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির উপর। গত বারো বছরে তারা শত শত ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে। কাউকে কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে, কাউকে পাথর দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে,

কাউকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, কারো হাত ও পায়ের রগ কেটে দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়েল অধ্যাপিকাদের পর্যন্ত শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে এবং এসবই তারা করেছে ইসলামের দোহাই দিয়ে।" আর ওই ঘোষণার শেষ স্তবকে স্পষ্ট বাক্যে উচ্চারিত হলো একটি কর্মসূচি : "আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ২১তম বার্ষিকীর দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশিষ্ট নাগরিক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত প্রকাশ্য গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার হবে।'

একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ধর্মীয় স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার। দেশবাসী জানে ঘাতক গোলাম আযমের দল জামাত-শিবির খুবই সংগঠিত এবং শক্তিশালী। তারা গত বিশ একুশ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পেয়েছে। টাকা পাচ্ছে অজস্র, অগণিত টাকা। নানা ধরনের ব্যবসা পাচ্ছে, বাণিজ্য করছে। আমরা জানতে পেরেছি তারা অস্ত্রও আনছে। তারা গোপন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে। দেশের কিছু জায়গায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তারা গোপন ঘাঁটি গড়ে তুলেছে, যেখানে তাদের ক্যাডারদের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মোটের ওপর জামাত-শিবির একটি ফ্যাসিবাদী ঘাতক সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠেছে–যা এক ভয়াবহ ধর্মীয় স্বৈরাচার। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তি এক না হলে এই কঠিন বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকবেলা করা যাবে না। আমাদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন, ধর্মীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ ঐক্যমত থাকতে হবে। এটা তো খুবই সাধারণ কথা, সবাইকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে হয়। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি যদি এই প্রশ্নে এক না হতে পারে তাহলে তারা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে–হত্যা করবে। তাদের নিষ্ঠুর, নির্মম বর্বর চেহারা তো আমরা এই সেদিনও দেখেছি–একাত্তরে। তাছাড়া একাত্তরে যারা শিশু-কিশোর ছিল এবং যাদের জন্ম একাত্তর-পরবর্তী সময়ে তারা তো গত বারো বছর দেখেছে জামাত-শিবির চক্রের পাশবিক মুখচ্ছবি।

আমরা ঠিক করলাম শুধু এই কারণে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশার সংগঠনগুলোর কাছে যেতে হবে, কথা বলতে হবে সবার সঙ্গে-আমাদের উদ্বেগের কথা জানাতে হবে। জানাতে হবে আমাদের উদ্যোগের কথাও। সকলকে ভাবতে হবে কি করে একসঙ্গে কাজ করা যায়। একাত্তরের ঘাতক-দালালদের প্রতিরোধের কার্যকর পথ বের করতে হবে। এই সকল ভাবনা নিয়েই একদিন আমরা কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানসহ চার-পাঁচজন সংসদ ভবনে গেলাম। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সঙ্গে কথা বলার জন্য। শেখ হাসিনা ছিলেন না, তিনি তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানার অসুস্থ স্বামীকে দেখতে সিঙ্গাপুর গেছেন। কথা বললাম আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে।

আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁদের অবগত করা হলো। তাঁরাও তাঁদের মতামত জানালেন। 'ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'তে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা আব্দুর রাজ্জাককে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। ততদিনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বী রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বেশ ভালো করেই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। আমরা একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চ' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠার খবর প্রকাশিত হলো ২৪ জানুয়ারি বিভিন্ন সংবাদপত্রে। সেখানেও দেখলাম মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীসহ ১০১ জনের নাম। খুব ভালো লাগলো। ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির বৈঠকে আমরা ঠিক করলাম তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে। এদিকে প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন সংবাদপত্রে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলো। ছাত্র নেতাদের সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন করলাম 'প্রতিরোধ মঞ্চে'র সঙ্গে। ৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র নেতাদের সঙ্গে ৩৩ তোপখানা রোডের বৈঠকে ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনার পর ৬ ফেব্রুয়ারি কর্নেল তাহের মিলনায়তনে ছাত্রদের আহ্বানে একটি মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত হলো। ৬ তারিখ যথারীতি অনুষ্ঠিত হলো সেই সভা। তাতে সভাপতিত্ব করলো নাজমুল হক প্রধান। ওঁরা আমাকে কিছু বলতে বললে আমি বলেছিলাম, 'আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে নামতে হবে এবং তা না পারলে আমরা বাঁচতে পারবো না। এদেশের নতুন প্রজন্মের সামনে অপেক্ষা করছে এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতে।' এরই মধ্যে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছিল, তরুণ-যুবক অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে ঘাতক-দাললদের বিরুদ্ধে জেগে উঠছে এক আলোড়ন।

৯ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী গেলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য উন্মোচনের জন্য। হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর মধ্যে এ এক অন্য উত্তেজনা। এখানে জামাত-শিবির বারে বারে হানা দেয় তরুণ তাজা জীবন কেড়ে নিতে। সংঘাত-সংঘর্ষ বিধ্বস্ত ওই চত্বরে ধর্মীয় স্বৈরাচারী শক্তিকে প্রতিরোধে সদা তৎপর ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলেছে তাদের পূর্বপুরুষের সংগ্রাম আর আত্মদানের মহান স্মৃতিতে উজ্জ্বল স্মারক ভাস্কর্য। সবকিছু দেখে আস্থা বাড়ছিল, মনে হচ্ছিল স্বদেশের এই নব-প্রজন্ম জাতির বীরত্বপূর্ণ অর্জনগুলো হারিয়ে যেতে দেবে না।

ঢাকা ফিরলাম ১১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন বিকেলে কর্নেল তাহের মিলনায়তনে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার দাবি করছে এমন সকল সংগঠন ও ব্যক্তিদের একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একসঙ্গে সবার বসার কথা। এরই মধ্যে 'প্রতিরোধ মঞ্চে'র সঙ্গে 'নির্মূল কমিটি'র গড়ে উঠছে খুবই ভালো সম্পর্ক। সে বিকেলের সভায়' একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি','মুক্তিযুদ্ধের

চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চ' ও ছাত্র সংগঠনগুলো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং মুক্তিযোদ্ধা-শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারী-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ। সভার শুরুতে ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান একটি চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বললো, 'আম্মা, আপনি এই চেয়ারটায় বসেন'। ওটা ছিল সভাপতির চেয়ার। সেদিন সকলকে নিয়ে সবার মিলিত সংগঠন। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হলো। এই কমিটিরও আহ্বায়ক করা হলো আমাকে।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। এই কমিটি একটি আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক পরিণতি, এর মানে সংগঠন এখানে প্রতিনিধিত্ব করছে আন্দোলনের প্রত্যয়ের। আন্দোলনকে আরো বিকশিত ও চূড়ান্ত পরিণতির জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই এই সাংগঠনিক অবয়ব। তাই একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিচারের দাবি উত্থাপনকারী সকল সংগঠন ও ব্যক্তির মিলিত সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে, 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। এতে সবাই আছেন–রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সংগঠনের প্রতিনিধি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ছাত্র সংগঠনসমূহ ও মুক্তিযোদ্ধারা। এই সংগঠনের লক্ষ্য খুবই রাজনৈতিক–আমরা একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার চাই। তবে এই রাজনীতি প্রচলিত রাজনৈতিক দলের রাজনীতি থেকে পৃথক। আমাদের সংগঠন ও ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন কোনো দলীয় বিষয় না–এটা একটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। যে সংগ্রাম শুধু ধর্মীয় স্বৈরাচারকে প্রতিরোধেই করবে না, বর্তমানকে বাঁচিয়ে রাখবে, জাতিকে এগিয়ে নেবে ভবিষ্যতের দিকে।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের পর কাজ আরো বেড়ে যায়। ১৪ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি কমিটির বৈঠক হলো। এছাড়াও প্রতিদিন সারাদিন ধরে মিটিং করতে হচ্ছিল নানা দল, বহু সংগঠন ও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে। সবাই যার যার মতো করে কথা বলছেন, আলোচনা করছেন, চেষ্টা চালাচ্ছেন নানা মত নানা পথে বিশ্বাসী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বী সকল শক্তিকে একজোটে এনে কাজ করতে। গত বিশ বছর ধরে আমরা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন থেকে মৌলবাদী স্বৈরাচারকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছি। অতীতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে-একজোট না হলে এগুনো যাবে না। অত্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে বহুমতকে ধারণ করেই এগুতে হবে। এগিয়ে যাওয়ার পথে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ আমাদের লক্ষ্য খুব সুনির্দিষ্ট। সকলেই একাত্তরের ঘাতক-দালাল রাজাকার, আলবদর, আলশামস অর্থাৎ জামাত-শিবির চক্রের বিচার চান।

'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখেই

ঘোষণা করে দিয়েছিল ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ২১তম বার্ষিকীর দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে প্রকাশ্য গণআদালতে একাত্তরের ঘাতক ও বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দালার গোলাম আযমের বিচার হবে। ২৬ মার্চ গণআদালত অনুষ্ঠানের এই সময়সূচি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব শুরু থেকেই সংশয় প্রকাশ করছিলেন। তাঁরা আরো প্রস্তুতির কথা বলছিলেন। বলছিলেন, রোজার মধ্যে এই কর্মসূচি সফল করা কি করে সম্ভব! অতীতে কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম রোজার মাসে দানা বাধে নি। কারণ মানুষ সারাদিন রোজা থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খুব একটা আগ্রহ থাকে না সভা-সমাবেশে যোগদানের। ঈদের আগে টাকা-পয়সা যোগাড়ের নানা চিন্তায় মগ্ন থাকে। তারপর থাকে ঈদের কোনাকাটার ব্যস্ততা। তাঁরা জনগণের নানা সুবিধা, সমস্যা-সীমাবদ্ধতার বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই তাঁদের মতামত দিচ্ছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছিলেন কি করে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাঁদের অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান, সর্বশেষ সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী নয় বছরের লাগাতার আন্দোলন এবং এর সাফল্যও তার প্রমাণ। প্রথম থেকেই আমরা সবার কথা শুনে, সবার বিবেচনাকে মূল্য দিয়েই এগুচ্ছিলাম। মনে হয় তাঁরা একটু ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছিল ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের একটি আলাদা তাৎপর্য আছে। গণআদালত এবং এই আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে এই দিবসের খুব গভীর সম্পর্ক–জড়াজড়ি করে থাকা একই আবেগ। তাছাড়া ১৯ জানুয়ারি যখন গণআদালতের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় তারপর থেকেই সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্য, আগ্রহ অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছিল-যা আমাদের আস্থা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

উপরন্তু ঘোষিত কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে আসতে মন সায় দিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, মানুষ মনে না করে আমরা পিছিয়ে আসছি। সব কিছু বিবেচনায় রেখে ২৬ মার্চ গণআদালত অনুষ্ঠানের প্রশ্নে আমি একটু জোরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। অবশ্য কয়েকদিনের আলাপ-আলোচনায় ঐকমত্যে পৌঁছাতে আমাদের খুব কষ্ট হয় নি। বহুমতের অনেক মানুষকে নিয়ে একজোটে কাজ করতে একটু যত্নশীল হতে হয়। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে একমত তৈরিতে সমস্যা হয় না। কারণ সব প্রস্তাবই তো উত্থাপতি হচ্ছিল খুবই সৎ ও আন্তরিক অনুভূতি থেকে। যাক, অবশেষে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা গেল ২৬ গণআদালতে ঘাতক গোলাম আযমের বিচার হবে।।

আর্থিক সাহায্য

জাহানারা ইমামকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ফোন করে জানালা আমরা নিউ ইয়র্কে ইতিমধ্যে আন্দোলন শুরু করেছি। বাংলাদেশের আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার

চালিয়ে যাচ্ছি। প্রবাসীদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে সচেতনতা বাড়াতে চেষ্টা করছি।

জাহানারা ইমাম জানালেন নির্মূল কমিটি ইতিমধ্যে ১৯ জানুয়ারি ঘোষণা পত্রে পেলাম আযমের যুদ্ধপরাধের বিচারের জন্যে গণআদালত বসিয়ে বিচার করবে। জাতীয় সমন্বয় কমিটি তা অনুমোদন করেছে। সারা বাংলাদেশে আন্দোলনের পক্ষে জেলায় জেলায় কমিটি হচ্ছে। প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বিশেষ করে নূতন প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক সারা মিলছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অর্থের অভাব। টাকার অভাবে কর্মীদের রিকসার পয়সা দিতে পারছি না। খাবারের তো প্রশ্ন উঠছে না। জাহানারা ইমাম জানালেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তখন ব্রুনাই এ অবস্থান করছিলেন। আন্দোলনে আওয়ামী লীগের অবস্থান ও সাহায্য কি রকম হবে তা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে না আসা পর্যন্ত জানা যাবে না। জাহানারা ইমাম আর্থিক সাহায্য দিতে পারব কিনা জানতে চাইলেন। যদি পারি, তবে দ্রুত আর্থিক সাহায্য পাঠাতে হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দেশে ফিরলে এক ব্যবস্থা হবে। আমি খালাম্মাকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলাম। আন্দোলন চালিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম।

আমি নিউ ইয়র্কে আমাদের কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করলাম। কমিটিকে জাহানারা ইমামের ফোন আলাপের সারসংক্ষেপ সবাইকে অবহিত করলাম। বিশেষ করে আর্থিক সাহায্যের কথা উল্লেখ করলাম। সকলের মধ্যে প্রবল উৎসাহ। মিটিং এ ভালো অর্থ সংগ্রহ হলো। এ কাজে বিশেষ অবদান রেখে ছিলেন ব্রুকলীনের মোহাম্মদ হানিফ। আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে ছাব্বিশ শত ডলার সংগ্রহ করলাম এবং দ্রুত জাহানারা ইমামের কাছে পাঠালাম। এর পরে মার্চ মাসে আরও এক হাজার ডলার পাঠিয়ে ছিলাম।

জাহানারা ইমাম প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, আমাদের পাঠানোর ডলার দিয়ে আন্দোলনের পক্ষে প্রথম পোস্টার ছাপানো হয়েছিল। ঢাকা শহরে গণআদালতের বিচারের পোস্টার দেখেই দলে দলে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়তে থাকে। কর্মীদের সামান্য খরচ দিতে শুরু হলো।

আমাদের পাঠানো অর্থের ফলাফল শুনে খুব ভালো লাগল। আমাদের কমিটির সদস্যবৃন্দ এ খবর শুনে আরও উৎসাহিত হলেন। আমাদের আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকল।

গণ আদালতের গোলাম আযমের যুদ্ধপরাধের বিচারের সমর্থনে আমরা নিউ ইয়র্কে আন্দোলন অব্যাহত রাখলাম। ঢাকা থেকে নির্মূল কমিটির ১০১ একজনের মধ্যে অন্যতম নাট্যকার অভিনেতা মামুনুর রশীদ নিউ ইয়র্কে আসেন। ওনাকে নিয়ে আমরা ম্যানহাটানে মিটিং করি সম্ভবত ফেব্রুয়ারি শেষে অথবা মার্চের প্রথমে। মামুনুর রশীদ ঢাকায় চলমান আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের অবহিত

করলেন। আমরা নিউ ইয়র্কে আমাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত ওনাকে অবহিত করলাম। আমাদের আন্দোলনের কথা জাহানারা ইমামকে অবগত করার জন্যে অনুরোধ করলাম। মামুনুর রশীদ সে কথা রেখেছিলেন। জাহানারা ইমাম এক চিঠিতে মামুনুর রশীদের কথা লিখেছিলেন।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত আরও অনেক নেতাদেরকে নিয়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে জনসংযোগ করেছি যুদ্ধাপরাধের বিচারের আন্দোলনের পক্ষে।

জাহানারা ইমাম অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন ওনাকে প্রতি সপ্তাহে ফোন করি এবং আমাদের কর্মকাণ্ড উনাকে অবহিত করি। মার্চ মাসের প্রথম দিকে ওনার সাথে ফোন করে জানতে পারলাম উনার ব্যস্ততার কথা। ২৬শে মার্চ গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের পক্ষে বিপক্ষে কমিটির ভিতরে এবং বাইরে নানা সমস্যার কথা। তিনি আরও জানালেন খালেদা জিয়া সরকারের ভয়ভীতির কথা।

এ ছাড়াও ছিল আভ্যন্তরীণ সমস্যা। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দেশে ফিরে জাহানারা ইমামের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। যদিও ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাককে সমন্বয় কমিটির সিটায়ারিং কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি নির্বাচিক করা হয়েছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগের শত ভাগ সমর্থন তখনো আসতে শুরু করে নি। জাহানারা ইমাম জানালেন, কমিটিতে বাম ঘরানার কিছু কিছু নেতাদের আওয়ামী বিরোধী মনোভাব ছিল। এদের অনেকের আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একধরনের এলার্জি ছিল বিনা কারণে অথচ গণআদালতের বিচার সম্ভব হবে না আওয়ামী লীগের শতভাগ সমর্থন ছাড়া।

জাহানারা ইমাম চারদিকে মানিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আন্দোলনকে সামনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এর উপর ক্যান্সারের যন্ত্রণা। ভগ্নস্বাস্থ্য। টাকা পয়সার অভাব। এ সব সত্বেও তিনি সারাদিন মিটিং, ঢাকার বাইরে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জানালেন কারও কোনো ব্যক্তিগত বা আদর্শগত কারণে তিনি আন্দোলন ব্যর্থ হতে দিতে পারেন না। বামদের আওয়ামী লীগ এলার্জি আন্দোলনকে ব্যহত করছিল। আওয়ামী লীগের সমর্থন ছাড়া মিটিং এ জনসমাবেশ হবে না জেনেও বামরা আপত্তি করছিল আওয়ামীলীগ নেতাদের জনসভায় যথাযথ সম্মান দেখাতে। একদিন তিনি, বেবী মওদুদ, মতিয়া চৌধুরীকে নিয়ে শেখ হাসিনার সাথে তার বাসভবনে বসলেন। আন্দোলনের অগ্রগতি, সমস্যা এবং করণীয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করলেন। জাহানারা ইমাম স্পষ্ট করেই বললেন, আওয়ামী-লীগের শতভাগ সমর্থন ছাড়া গণআদালত সাফল্য মণ্ডিত করা যাবে না। আলোচনায় এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে এই বিশিষ্ট চার মাহিলা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন আবেগের তাড়িত হয়ে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর পিতার হত্যার বিচার চেয়েই তিনি অনেকের কাছে গিয়েছিলেন। আশানুরূপ সাহায্য পান নাই। বামদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি কি ডেকোরেটর যে অনুষ্ঠান আয়োজন

করে ঘরে বসে থাকব। সেদিন জাহানারা ইমাম আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। শেখ হাসিন জানালেন আব্দুর রাজ্জাক এবং মোফাজ্জল হোসেন মায়াকে যোগাযোগ করতে। তাঁরা জাহানারা ইমামকে সবরকমের সহায়তা করবেন।

এর কিছুদিন পর জাহানারা ইমামকে আবার ফোন করলাম। তিনি জানালেন, আন্দোলন বেগবান হচ্ছে। চারদিকে লোকজনের মধ্যে সাড়া জেগেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সবাই সমন্বয় কমিটির ছত্রছায়ায় জড়ো হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমরা কি আমেরিকা থেকে ২৬ মার্চের গণআদালতে কোনো বিদেশী পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারবে কি না। কোন বিদেশী সাংবাদিক পাঠাতে পারব কি না। তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমস এর একজন মহিলা সংবাদিকের নাম দিলেন যিনি তাঁর পূর্ব পরিচিত। আমি উত্তরে জাহানারা ইমামকে আশ্বাস দিলাম, আমরা পারব।

এর্টনি থমাস কিটিং

আমাদের কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করলাম। জাহানারা ইমামের বিদেশী সাংবাদিক এবং বিদেশী পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ কথা জানালাম। আমি কমিটিকে অবগতি করলাম, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিকের সাথে কথা হয়েছে। তিনি আমেরিকাতে তার গুরুত্বপূর্ণ এসাইনমেন্ট রয়েছে। তাই মার্চ মাসে তিনি আমেরিকার বাইরে যেতে পারবেন না। তবে তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমস এর ভারতের নয়াদিল্লীতে অবস্থিত সাংবাদিককে ঢাকা যেতে অনুরোধ করবেন। কমিটিতে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো আমরা আমেরিকা থেকে গণআদালতে একজন পর্যবেক্ষক পাঠাব। আমরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছুক পর্যবেক্ষক খুজতে লাগলাম। আমাদের কমিটির সদস্য মূলধারার সাংবাদিক বদিউজ্জামান খসরু জানালেন, তিনি একজন এটর্নির খোঁজ পেয়েছেন। তিনি খুব সম্ভবত বাংলাদেশে যেতে রাজী হতে পারেন। আমি খসরুকে বললাম তাঁকে আমাদের সাথে দেখা করানোর ব্যবস্থা করার জন্যে। এটর্নির নাম থমাস কিটিং। থাকেন নিউ ইয়র্ক শহরের উত্তরাঞ্চেলে। আমরা ম্যানহ্যাটানের একটি রেস্টুরেন্টে ডিনারে বসলাম এটনী কিটিং এবং সাথে আমরা কজনা ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, খসরু, ফরাশত আলী এবং আমি। আমরা তার বাংলাদেশের ভ্রমণের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধপরাধ, গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীর শক্তির উত্থান, যুদ্ধপরাধের বিচার ক্রিয়া বন্ধ ইত্যাদি। সবশেষে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটির আন্দোলন ও গণআদালতের কথা। এটর্নি কিটিং খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বয়সে তরুণ এই এটর্নি আমাদের প্রস্তাবটিতে একটু অ্যাডভেনচারের গন্ধ পেলেন বলে মনে

হচ্ছিল। আমরা গণআদালতের বিচারের তাৎপর্য-বুঝিয়ে বললাম। এ রকম একটি ঘটনায় তার উপস্থিতি তার জন্যেও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি নিরাপত্তার প্রশ্ন তুললেন। আমরা ওনাকে আশ্বস্ত করলাম। তাঁর যাতায়াতের খরচ ছাড়াও হাতে কিছু হাত খরচ দিব বলে জানালাম। তার যথাযথ পরিশ্রমিক দিতে পারব না বলে দুঃখ প্রকাশ করলাম। জানালাম যে আমাদের কোনো গ্রান্ট নেই। আমরা সবাই নিজ খরচে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি শুধু দেশ প্রেমের জন্য। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে আমরা জাতির কলঙ্ক মুক্ত করতে চাই। এটর্নি কিটিং আমাদের কথায় আস্থা রাখলেন। তাঁর ঢাকা যাবার টিকেট এবং ঢাকায় তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, এটর্নি কিটিং এর ঢাকা যাবার সমস্ত খরচ আমি এবং ফরাশত আলী বহন করেছিলাম।

জাহানারা ইমামকে সুখবরটি জানালাম ফোনে। আমরা থমাস কিটিং নামে আমেরিকান এক এটর্নিকে গত আদালতে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে পাঠাচ্ছি। জাহানারা ইমাম শুনে খুব খুশি হলেন। আমি তার নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করলাম। খালাম্মা জানালেন, নবী ও নিয়ে চিন্তা করো না। আমরা তাকে নিরাপত্তা দিব। তিনি আরও জানালেন, বিদেশী পর্যবেক্ষক এর উপস্থিতি গণসংযোগ ও প্রচারের জন্যে খুব জরুরি। তিনি অন্যদেশের সমন্বয় কমিটিগুলোকে পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তখনো কোন সাড়া পান নি।

নিউ ইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

২৬ মার্চের আগে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নিউ ইয়র্কে এলেন। ম্যানহাটানের পার্কের কাছে প্লাজা হোটেলে অবস্থান করছিলেন। আমাদের কমিটি সিদ্ধান্ত নিল আমরা হোটেলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। আমাদের দাবি-যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার চাই। গণআদালতের বিচারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে প্রবাসীদের ইত্যাদি প্লাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করা হবে। বিক্ষোভ দিন ভীষণ শীত। তাপমাত্রা মাইনাস নেমেছে। আগের দিন রাত্রে বরফ পড়েছে। যা জমে চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে। তা সত্ত্বেও শত শত লোক আমাদের বিক্ষোভে যোগ দিল। গণআদালতের বিচারের সমর্থনে শ্লোগানে শ্লোগানে এলাকার লোকের দৃষ্টি কেড়ে নিল। বেগম খালেদা জিয়া হোটেল থেকে বেরুবার পথে তাদের কে দেখে বিরক্ত হয়েছিল। একনাগাড়ে টানা তিন ঘন্টা আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলাম।

একটি বিষয় উল্লেখ না করলে নয়। আমাদের অপর যৌথ আহ্বায়ক কাজী-জাকারিয়া বৃদ্ধ মানুষ। কিছু দিন আগে হার্টের অপারেশন হয়েছে। তিনি সে শীতে আমাদের সাথে শ্লোগান দিচ্ছিলেন। আমি ভয় পেলাম যদি শীতে ওনার শরীর খারাপ হয়। আমি জাকারিয়া ভাইকে অনুরোধ করলাম বাসায় যেতে। তিনি রাজী হলেন না। বললাম তাহলে পাশে কোন একটি কফি হাউসে গিয়ে বিশ্রাম নেন। তিনি তাতেও রাজী হলেন না।

জাকারিয়া ভাই বললেন, আমি ঠিক আছি। কোনো চিন্তা করবেন না। ওনার উৎসাহ দেখে সকলেই আরও উৎসাহিত হলেন। আমাদের বিক্ষোভ খুব সাফল্য মণ্ডিত হলো। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সফর সঙ্গী বাংলাদেশের মিডিয়ার লোকজন আমাদের সে বিক্ষোভ বাংলাদেশে প্রচার করেছিল। আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা না বললে নয়। বরফের জন্যে নিউ জার্সি থেকে ম্যানহাটানে আসতে অনেক সময় লেগে গেল। আমি যখন বিক্ষোভ স্থলে পৌছালাম তখন বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। পাছে আর দেরী না হয়। আমি হোটেলের ভেলে পার্কিং এ গাড়ি দিয়ে দিলাম। বিক্ষোভের পর গাড়ি নিতে গেলাম। পাকিং বিল দুইশত ডলার। যদি আসে পাশের পার্কিং গ্যারেজে খুজতাম তাহলে বিশ ডলারে পেয়ে

যেতাম। ভাল শিক্ষা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্র সমন্বয় কমিটি সাক্ষাতের এর অনুমতি নিয়েছিলাম। বিক্ষোভের দিন বিকেল বেলায় প্রধানমন্ত্রীর হোটেলে কক্ষে। আমরা গেলাম আযমের যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি জানিয়ে একটি স্মারক লিপি দেব প্রধানমন্ত্রীর হাতে। হোটেল কক্ষে সাক্ষাৎকারের জন্যে পাশের কক্ষে আমরা বসে ছিলাম। আমাদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন আমি ও ফরাশত আলী ছাড়া আওয়ামীলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরুল ইসলাম অনু এবং আবদুস সালাম এবং জাসদের মোসাব্বির। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমাদের ডাক পড়ল। আমরা সাক্ষাৎকার কক্ষের দরজার পৌছালাম। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা দলের সদস্য প্রবেশ দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা মুখোমুখি হতেই জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মধ্যে ড. নবী কে? আমি জবাব দেওয়ার আগেই শুনতে পেলাম দরজার পেছন থেকে কে জেনে বলল। ঐ তো সবার সামনে বেটে লোকটি। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী সাবিউদ্দীন আহমেদ আমাদেরকে অবাক করে বললেন, ড. নবী ছাড়া সবাই ভিতরে যান। আমি এটার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ফরাশত আলী জিজ্ঞেস করলেন কেন ড. নবী যেতে পারবেন না। তিনি তো আমাদের দলনেতা। উত্তরে জানালেন, উপরের নিষেধ আছে। আর একজন তাচ্ছিলভাবে বলল, উনিতো হোটেলের সামনে বিক্ষোভ করছেন এতক্ষণ, এখন দেখা করার কি দরকার। ফরাশত আলী বললেন, ড. নবী না গেলে আমি ও যাচ্ছি না। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতারা কক্ষে ঢুকে পড়লেন। ফরাশত আলী খুবই রেগে গিয়েছিলেন। আমি উনাকে আশ্বস্ত করে বললাম আমাদেরকে সরকারের গোয়েন্দার ঠিকই চিনেছে। এর মানে আমরা সার্থকভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং আমাদের আন্দোলন সামনের দিকে এগিযে যাচ্ছে। ওরা ঠিকই টের পেয়েছে ওদের বিরুদ্ধে কারা।

সে দিন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছিল স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিক কৌশিক আহমেদ জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণআদালতে গোলাম আযমের যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। খালেদা জিয়া উত্তেজিত হয়ে গিয়ে বলেন, জাহানারা ইমামটা কে, কিসের গণআদালত? আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফেতনা বলে কিছু বুঝি না! প্রধানমন্ত্রীর এ রকম মন্তব্যে উপস্থিত সাংবাদিকগণ অবাক হন। শহীদ জাহানারা ইমামকে প্রধানমন্ত্রী চেনে না। সেটা কি করে সম্ভব। জাহানারা ইমাম একজন শহীদ এর মা। যুদ্ধে তার স্বামী শহীদ হয়েছেন। তিনি গত ১৯ জানুয়ারি থেকে গণআদালতের পক্ষে সারা বাংলাদেশে আন্দোলনের নেতৃত্বে দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তো জাহানারা ইমামকে না চেনার কথা নয়। জাহানারা ইমামের সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার যৌথ আহ্বায়ক আমাকে তার গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা চেনে। আর প্রধানমন্ত্রী জাহানারা ইমামকে

চেনেন না। সেটা কিভাবে সম্ভব। নানা প্রশ্ন আমাদের মনে।

আমাদের আশংকা হলো পুলিশ হয়তো সে রাতেই জাহানারা ইমামকে গ্রেপ্তার করবে। সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হতেই ঢাকাতে জাহানারা ইমামকে ফোন করলাম। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাংবাদিক সম্মেলনের সব কথা উনাকে জানালাম। সঙ্গে আমাদের আশংকার কথাও। পুলিশ হয়তো অনেকে গ্রেপ্তার করতে পারে। জিজ্ঞেস করলাম গোয়েন্দার লোকেরা কি আমাদের কোনো কথা আড়িপেতে শুনছে? জাহানারা ইমাম বললেন, পুলিশ আমার বাড়ি সবসময় ঘিরে রেখেছে। ওদের কি নিয়ে ভয় পাই না। আমি জেনে শুনে তো আন্দোলনের নেমেছি। এখন আর ভয় পাই না। যে ক্যান্সারের সাথে বসবাস করছে তার আবার পুলিশের ভয় কি? তিনি বললেন, নবী তোমরা আমার জন্যে চিন্তা করো না। আন্দোলন চালিয়ে যাও। পরের দিন জাহানারা ইমামের কাছ থেকে একটি ফ্যাক্স পেলাম। কয়েকটি টেলিফোন এবং ফ্যাক্স নম্বর। তাঁকে যদি গ্রেপ্তার করে, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির নম্বর দ্বিতীয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি গ্রেপ্তার হয়, তবে তৃতীয় ব্যক্তির নম্বর। এইভাবে পাচ জনের নম্বর পাঠিয়ে ছিলেন। সেটার আর দরকার হয় নি। কিন্তু তিনি নেতৃত্বে দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কি করণীয় তা তিনি জানতেন। সব পরিস্থিতির জন্য ওনার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছিল।

গণআদালত

একাত্তরে ঘাতক দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন জাতীয় সমন্বয় কমিটি ২৬ শে মার্চ গণআদালতে গেলাম আযমের বিচারের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। দুই মাস ব্যাপী পরিশ্রমের ফল পেতে যাচ্ছে আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। দিন রাত কাজ চলছে। নূতন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছে। গড়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী স্কোয়াড।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২৩ মার্চ নিউ ইয়র্ক থেকে দেশে ফিরলেন। গোলাম আযমকে পরের দিন গ্রেফতার করা হলো বিদেশী নাগরিক হয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে বাস করার জন্যে এবং বিদেশী নাগরিক হয়ে জামাতে ইসলামীর আমির হওয়ার জন্যে। যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে নয়। এ দিকে আমরা চারিদিকে গুজব শুনছি ঢাকাতে জাহানারা ইমাম সহ সমন্বয় কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হবে। সরকার যে কোনো মূল্যে গণআদালত করতে দিবে না। সে সময় জাহানারা ইমামকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি অন্যান্য নম্বরে ফোন করে পরিস্থিতি জানতে চেষ্টা করছিলাম।

এদিকে গণ আদালতের কয়েকদিন আগে এটর্নি থমাস কিটিং ঢাকা রওনা হয়েছেন। তাঁর ঢাকা পৌছানো এবং নিরাপদ অবস্থানের চিন্তিত ছিলাম। জাহানারা ইমাম জানিয়েছিলেন, শহীদুল্লাহ খান বাদল এটর্নি কিটিং এর থাকা খাওয়া ও

নিরাপত্তার জন্যে দায়িত্ব নিয়েছেন। শুনে আশ্বস্ত হলাম। বাদল আমাদের ব্যাচমেট। পদার্থ বিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছিল। রাশেদ খান মেননের ছোট ভাই, মেধাবী ছাত্র ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাহানারা ইমামের ছোট ছেলে জামী আমেরিকায় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায় বাদল জাহানারা ইমামের দেখাশুনা করত। শহীদ রুমীর বন্ধু বাদল। জাহানারা ইমামের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। বাদলকে এটর্নি কিটিং এর দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়ার আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

সরকারের নানা বাধা, ভয় ভীতি ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গণআদালত বসল এবং গোলাম আযমের বিচার হল। একাত্তরের যুদ্ধ পরাধের জন্যে গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হল। সৃষ্টি হল এক নূতন ইতিহাসের। জনতার জয় হল। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করল একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে কোনো আপোস নাই। নিউইয়র্কে ফিরে এসে এটর্নি কিটিং জানালেন বাংলাদেশে তার অভিজ্ঞতার কথা। এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও নূতন অভিজ্ঞতা। তিনি ঢাকা পৌছেই বাদল খানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ঢাকা ক্লাবের হোটেলে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার সঙ্গে সব সময় নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত ছিল। গণআদালতের দিন নিরাপত্তার কর্মী বেষ্টিত হয়ে গণআদালতে যান এবং পর্যবেক্ষক হিসাবে গোলাম আযমের বিচার পর্যবেক্ষণ করেন। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ দেখে তিনি অভিভূত হন। গণআদালত বিচার সম্পর্কে তিনি এই ভাবে তার পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার এই বিশাল সমাবেশ পৃথিবীতে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সাহসিকতা ও ধৈর্যের কাহিনী শুনেছেন, কিন্তু প্রথমবারের মতো গণআদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সমেবত হয়ে ঘৃণা প্রকাশ করায় তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেছে। আমি আমেরিকায় ফিরে বাঙ্গালিদের এই সাহসিকতা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

তিনি আরও বলেন, গণআদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নতুন ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনতার সমাবেশ প্রমাণ করেছে যে জনমতই গণতন্ত্রের নির্ধারক শক্তি। তিনি বলেন, জনসভাবেশের মাধ্যমে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছে, জনগন সঠিক বিচার চায়। বিচারকার্যে জনগণের এই অংশ গ্রহণ ১৯৭১ সালে তাদের প্রতি অত্যাচার সন্ত্রাস, গণহত্যা, ধর্ষণের প্রতীকী প্রতিবাদ। ওর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যুদ্ধাপরাধীদের জন্যে এরকম গণআদালত বসতে পারে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হয়েছে তাদের সঙ্গে বসতে পেরে আমি গর্বিত। এ বিষয়ে জাতিসংঘ, কংগ্রেস ও সিনেটে আমি কথা বলব।

এটর্নি কিটিং এর উপরোক্ত বক্তব্য বাংলাদেশের অনেক পত্রিকাতে ফলাও করে ছাপানো হয়। যদিও তিনি বেসরকারি একজন এটর্নি, বাংলাদেশের কিছু কিছু পত্রিকায় ভুল করে ছাপা হয়েছিল আমেরিকান এটর্নি জেনারেল গণআদালতে উপস্থিত থেকে গোলাম আযমের ফাঁসির রায় পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটর্নি কিটিং ঢাকায় অবস্থানকালে সমন্বয় কমিটি সাব্বির মোস্তফা এবং সৈয়দ শামসুল হকের সাথে মিশেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া এক পার্টিতে অংশ গ্রহণ করেন। গণআদালতে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে তিনি আমাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আমরা প্রবাসে গণআদলতের সাফল্যে উৎসাহিত হলাম। প্রবাসে আমাদের আন্দোলনের পালে হাওয়া লেগে। বেগবান হল।

জাহানারা ইমামের চিঠি

আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ফোনে জানালেন তোমাদের যুক্তরাষ্ট্র কমিটির সাহায্য আমাদের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়ক হচ্ছে। রাজ্জাক ভাই সমন্বয় কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি। এর আগেও কয়েকবার উনার সাথে কথা হয়েছে। তিনি বললেন, তোমার পাঠানোঅর্থ নির্মূল কমিটির অ্যাকাউন্টে এসেছে। অথচ এখন আন্দোলন হচ্ছে সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে। এর পর কোন অর্থ পাঠালে তা সমন্বয় কমিটির কাছে পাঠাবে। আমরা তাই করেছিলাম। পরের বার সমন্বয় কমিটির একাউন্টে পাঠিয়েছিলাম।

পরে জানতে পেরেছিলাম আমাদের এখানে ও সে বিষয়ে কানাঘুষা হয়েছিল। রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। খুব সম্ভবত তারা ঢাকা থেকে তাদের দলের ফিডব্যাক পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্মূল কমিটিতে রাজনৈতিক দলের কোন প্রতিনিধি নেই। সেটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধীজীবী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও রয়েছে।

আমি এ বিষয়ে সমন্বয় কমিটির আহ্বায়িকা জাহানারা ইমামকে জানালাম। তিনি এই অসন্তোষের কথা জেনে একটু আশ্চর্য হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন আন্দোলনের প্রথম দিকে অর্থ পাঠিয়েছি, সে সময় সমন্বয় কমিটির কোনো ব্যাংক একাউন্ট ছিল না। শুধুমাত্র নির্মূল কমিটির ব্যাংক একাউন্ট ছিল। তাছাড়া তোমরা যে টাকা পাঠিয়েছিলে, তা দিয়ে নির্মূল কমিটি আন্দোলনের জন্যে পোস্টর ছাপিয়েছে সমন্বয় কমিটির নামেও। আন্দোলনের কর্মীরা সে পোস্টার সারা দেশে প্রচার করেছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, জাহানারা ইমাম একজন সৎ নেতা ছিলেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রেখে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সে আভ্যন্তরিক মত পার্থক্য হউক বা আর্থিক ব্যায়ের হিসাব হোক। সব বিষয়ে তিনি

সততা ও স্বচ্ছতার ব্যাপারে কোনো অবহেলা বা আপোষ করেন নাই। আমরা যে অর্থ পাঠিয়েছিলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্তি সংবাদ ফ্যাক্স বা পত্র মারফত জানাতেন।

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র সমন্বয় কমিটি ছিল নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক। এ ছাড়াও আমরা আরও দুটি শাখা করেছিলাম। একটি বোস্টনে। এর নেতৃত্বে ছিলেন ড. বামন দাস বসু, মাহফুজ, বিন্দু এবং আরো অনেকে। আর একটি ছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে। এর নেতৃত্বে ছিলেন, ড. খোরশেদ আলম চৌধুরী, হারুন চৌধুরী। সাইফুল ইসলাম সহ আরও অনেকে। এ দুটি শাখা কমিটি চেয়েছিল আমাদের মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে। আমি স্বচ্ছতার জন্যে সরাসরি জাহানারা ইমামের কাছে অর্থ পাঠাতে পরামর্শ দেই। ওরা সরাসরি জাহানারা ইমামের কাছে তাদের অর্থ পাঠিয়ে ছিল। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দীন আহমেদ আমাকে জানালেন জাহানারা ইমাম আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন দুতাবাসের কূটনৈতিক ব্যাগে। আগেই উল্লেখ করেছি, মহিউদ্দীন ভাই আমার এবং জাহানারা ইমামের চিঠি ও অন্যান্য কাগজপত্র আন্দোলনের শুরু থেকে গোপনে কূটনৈতিক সহযোগিতা করে আসছিলেন। সেই দিনই নিউ ইয়র্কে মহিউদ্দীন ভাই এর অফিস থেকে জাহানারা ইমামের চিঠিটা সংগ্রহ করি।

৫ জুন। ১৯৯২ তারিখে লেখা চিঠিতে জাহানারা ইমাম আমাদের প্রথম কিস্তিতে পাঠানো অর্থ যা নির্মূল কমিটির ব্যাংক একাউন্টে জমা হয়েছিল। তা কি ভাবে ব্যয় হয়েছে। তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝি যাতে না হয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয় কমিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জাহানারা ইমামের এ চিঠিটা আমাদের কমিটির সদস্যবৃন্দকে দেখালাম। তারা সবাই খুশি হলেন এবং আরও উৎসাহ নিয়ে আন্দোলনে কাজ করতে থাকলেন।

উল্লেখ্য, আমি এ চিঠিখানা হারিয়ে ফেলেছিলাম। গত বৎসর ঢাকাতে মহিউদ্দীন ভাই এর সাথে দেখা কথা প্রসঙ্গে আমার চিঠি হারানোর কথা উল্লেখ করেছিলাম। পরের দিন তিনি ফোনে আমাকে জানালেন, ড. নবী, আপনার জন্যে একটি বিশেষ উপহার আছে। পরে দেখা হতেই তিনি জাহানারা ইমামের চিঠির একটি কপি আমাকে দিলেন। সত্যিই সে চিঠিখানা আমার জন্যে এক বিশেষ উপহার। ধন্যবাদ মহিউদ্দীন আহমেদ। নিচে জাহানারা ইমামের সেই ঐতিহাসিক চিঠি খানা দেওয়া হলো।

স্নেহের নূরুন নবী, ঢাকা ৫ জুন ৯২

গতমাসের ছয় তারিখে আপনাকে ফ্যাক্স মারফত আপনাদের পাঠানো ২৬০০/= (ছাব্বিশ শত) ডলারের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাঠিয়েছি। তারপর আপনার কাছ থেকে আর কোন খবর পাই নি। মামুনুর রশীদ কয়েকদিন আগে ঢাকা ফিরেছেন তাঁর মুখে আপনাদের সবার কথা শুনলাম। লোকমুখে জানতে পারলাম, আপনাদের পাঠানো ছাব্বিশ শত ডলার একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ফান্ডে গেছে, জাতীয় সমন্বয় কমিটির ফান্ডে যায় নি–এই নিয়ে আপনাদের ওখানে কিছু ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমি এখন কিছু কথা আপনাকে বলব। প্রয়োজন মনে করলে এই সব কথা (কিংবা আমার এই চিঠি) আপনি বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের জানাতে (কিংবা চিঠি দেখাতে) পারেন।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয় ৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি। এটি গঠিত হবার কিছু দিনের মধ্যেই গ্রিন্ডলেইজ ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয় –যার বিজ্ঞাপন বিচিত্রা ও অন্য কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছিল আমাকে। ১১ ফেব্রুয়ারি (তিন সপ্তাহ পরে) গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। এটিরও আহ্বায়ক করা হয় আমাকেই। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি একটি নির্দলীয় সংগঠন। আর জাতীয় সমন্বয় কমিটি সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ছাত্র সংগঠন, নারী, যুব, পেশা ও শ্রমজীবী সংগঠন সমূহের সমন্বয়ে গঠিত ও একটি দল নিরপেক্ষ জাতীয় ফোরাম। রাজনৈতিক দলগুলি কেবলমাত্র গোলাম আযম ও অন্যান্য ঘাতকদের বিচারের দাবি সম্পর্কিত কর্মসূচিতেই জাতীয় সমন্বয় কমিটির প্রতি একাত্মতা ও সমর্থন প্রকাশ করবেন। তাঁদের নিজ নিজ দলীয় কোনো কর্মসূচি এই ফোরামে আনতে পারবেন না। আওয়ামী লীগসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল এই নীতি মেনে নিয়েছেন। আপনারা ঢাকায় প্রাকশিত সেসব বাংলা পত্রপত্রিকা আমেরিকায় পেয়ে থাকেন। সে গুলিতে এই বিষয়টি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হবার পর এর নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে খোলার ব্যাপারে নানা কারণে দেরি হয়ে যায়। ২০ কিংবা ২২ মার্চ United Commercial Bank Ltd (U.C.B.L) নিউমার্কেট শাখায় Current Account নং 2004- খোলা হয়। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সমন্বয় কমিটির তেমন কোনো নির্দিষ্ট ফান্ড গড়ে ওঠে নি। তাৎক্ষণিক ভাবে অল্প সল্প চাঁদা অনেক কষ্টে জোগাড় করে দরকারী কাগজগুলি চালানো হচ্ছিল। কিন্তু লিফলেট, পোস্টার এসবের জন্য টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয় নি বলে ২৪ মার্চের আগে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নামে লিফলেট ও পোস্টার ছাপানো যায় নি। ২৪ মার্চ একটি লিফলেট ও একটি পোস্টার বেরোয় সমন্বয় কমিটি জোগাড় করা টাকায়। এর আগে পর্যন্ত পুরো সময়টা নির্মূল কমিটি নিজেদের ফান্ড থেকে জাতীয় সমন্বয়

কমিটির নামে লিফলেট ও পোস্টার ছেপে দিয়েছে শুধুমাত্র আন্দোলনের অগ্রগতির স্বার্থে। সঙ্গের লিফলেট ও পোস্টার গুলি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এইগুলি ছাড়াও নির্মূল কমিটি নিজেদের কমিটির নামে আরো বহু লিফলেট ও পোস্টার ছেপেছিল– সেগুলির বিবরণ, অপ্রয়োজন বিধায়, আপনাকে দিলাম না। তবে বাস্তব সত্য এই যে, সমন্বয়ের প্রকাশিত কোন লিফলেট পোস্টার না পেয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দলের কর্মীবৃন্দ ও ছাত্রসংগঠন গুলির ছেলেরা নির্মূল কমিটির প্রকাশিত লিফলেট, পোস্টার চেয়ে নিয়ে বিভিন্ন জেলা উপজেলায় সাংগঠনিক ট্যুরে গেছে। কারা এগুলো প্রকাশ করছে সেটার চেয়ে, সবার কাছে প্রয়োজনীয় ছিল গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে ২৬ মার্চ গণআদালতের বিষয়টি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেজন্য হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে গেছে। এই সব দেখে নির্মূল কমিটি জাতীয় সমন্বয় কমিটির নামেই পোস্টার লিফলেট ছেপে দিয়েছে শুধু নিচে ছোট করে নির্মূল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত, এ কথাটি লিখে দিয়েছে। আপনি জেনে অবাক হবেন, আওয়ামী ও ছাত্র লীগের ছেলেরা নির্মূল কমিটির অফিসে গিয়ে পোস্টার লিফলেট নিয়ে গেছে। যেটা তারা সমন্বয়ের অফিসে পায় নি। গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে সারা দেশের জনগণের মধ্যে এসবই সাড়া জেগেছিল যে, মানুষ পোস্টার লিফলেটের জন্য বুভুক্ষু হয়ে উঠেছিল। কর্মীরা হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে। পোস্টার লিফলেট যারাই ছাপুক। ভেতরের কথা তো একই– গোলাম আযমের বিচার চাই, ২৬ মার্চ গণ আদালতে তার বিচার হবে। জনগণ দেখে নি কারা ছেপেছে, দেখেছে কি লেখা আছে। ২৬ মার্চ গণআদালতের আগে পর্যন্ত আমাদের কি রকম কর্মকাণ্ড, ব্যতিব্যস্ত, উদ্বিগ্ন উদভ্রান্ত থাকতে হয়েছে, আপনারা কাগজ পড়ে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন। সে সময় সরকারের হুমকি, আমাদের গ্রেপ্তার করার ভয়ভীতি প্রদর্শন, স্পেশাল ব্রঞ্চের পুলিশের দৌরাত্ম–এত সব কিছু অগ্রাহ্য করে আমাদের এগোতে হয়েছে।

আপনারা আগে থেকেই আমার সঙ্গে পরিচিত, আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি করেছেন। তার সঙ্গে আমার নাম জড়িত দেখে আর বেশি উৎসাহিত হয়েছেন। ফোন করেছেন প্রতি সপ্তাহে দুতিনবার। আমিও উৎসাহিত এবং উদ্দীপ্ত হয়েছি। আমেরিকায় জনমত সংগঠিত করতে বলেছি, ফান্ড তুলে পাঠাতে বলেছি। নির্মূল কমিটির এ্যাকাউন্ট নং আপনারা আগেই দেখেছেন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মারফতে। এর মধ্যে নির্মূল কমিটি, সমন্বয় কমিটি–এসবের আলাদা ফান্ডের কথা ভাববার বা বলবার সময় কোথায়? তাছাড়া সমন্বয় কমিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতেই তো কত দেরি হল।

আপনাদের পাঠানো টাকা নির্মূল কমিটির ফান্ডে গেছে ঠিকই তবে সে টাকার

অপব্যবহার যে হয় নি, তার জন্যেই এত কথা আপনাকে জানালাম এবং লিফলেট ও পোস্টারের কপি এবং প্রেসের বিলের কপি পাঠালাম আপনাদের সবার অবগতির জন্য।

২৬০০/= ডলারের পরিবর্তে বাংলাদেশী টাকা পাওয়া গেছে। ১,০০৬৪২.৬২ (এক লাখ ছশো বিয়াল্লিশ টাকা বাষট্টি পয়সা) গ্রীন্ডলেইজ ব্যাংকের একটা কাগজও আপনাকে আগে ফ্যাক্স দ্বারা পাঠিয়েছি। সেটায় এই হিসাব পাবেন। নির্মূল কমিটির বিলে দেখবেন এর চেয়েও বেশি টাকা খরচ করেছে সমন্বয় কমিটির জন্য লিফলেট পোস্টার ছেপে। আশা করি যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁরা এবার সন্তুষ্ট হবেন। আমি প্রচণ্ড কাজের চাপে ব্যতিব্যস্ত, নিজস্ব সময় বলে কিছু নেই। আমার জীবনধারাই আমূল পাল্টে গেছে। এই বয়সে, ভগ্নস্বাস্থ্যে এবং এই গরমে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতেই হবে। সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প পথ নেই। সামনে মরণের গভীর খাদ থাকতে পারে। কিন্তু আমি প্রচণ্ড আশাবাদী যে সামনে বিজয়ের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর আছে। দোয়া করবেন, আমরা যেন শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে বিজয়ের ঐ সুবজ প্রান্তরে পৌঁছতে পারি।

এই চিঠি পাওয়া মাত্র ফোন করে জানাবেন যে, পেলেন কিনা। খুশি হব।

কিটিংকে এবং আপনাকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শীঘ্রই চিঠি দিচ্ছি। দেরি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখিত। আমাদের দক্ষ কর্মীর এখনো অনেক অভাব, সব কাজ ঠিকমতো গুছিয়ে করে উঠতে পারছি না।

দোয়া ও শুভেচ্ছা জানিয়ে–

আশীর্বাদিকা

খালাম্মা

P.S. U.C.B.L বলেছে, তাদের ব্যাংক বিদেশ থেকে ডলার পাঠালে ভাঙাবার অনেক অসুবিধে। তাই আমরা জাতীয় সমন্বয় কমিটির নামে গ্রীন্ডলেইজ ব্যাংকে আরেকটা একাউন্ট খোলার কথা ভাবছি। সেইজন্য আরো যদি ফান্ড তোলেন, তবে সেটা এখন আপনার কাছেই রাখবেন। পরে পাঠাবেন কিভাবে, জানাব।

নিউ ইয়র্কে। ১৯৯৩

১৯৯২ এর মাঝামাঝে জাহানারা ইমাম ফোনে জানালেন, তিনি আমেরিকায় আসবেন। আন্দোলনে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অনেকটা ক্লান্ত। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। ক্যান্সারের সাথে আমার বসবাস। ডাক্তার দেখানোর সময় অনেক আগেই পার হয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে এখন বর্ষাকাল। ঢাকার বাইরে গণসংযোগ বন্ধ। এটাই উপযুক্ত সময় আমেরিকায় আসার। জামী, ফ্রিদা, নাতনী লিয়ানা এবং লিনের্য়াকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি খালাম্মাকে বললাম, আমরাও আপনাকে দেখতে চাই। চলে আসেন। তিনি বললেন, তোমরা কিছু মিটিং এর ব্যবস্থা কর। যদি স্বাস্থ্য ভালো থাকে তবে তোমাদের ওখানেও আসব। অক্টোবর মাসে খালাম্মা মিসিগানে ছেলের বাসায় এলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। আমরা আমাদের কমিটির উদ্দেগে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও ওয়ার্শিটন ডিসি খালাম্মার জন্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলাম যদি তিনি মিসিগানে থেকে আসতে পারেন স্বাস্থ্যে ভালো থাকে, তবে এই সব মিটিংগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

মিশিগানে খালাম্মাকে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিলাম। আমাদের সব পরিকল্পনাগুলো ওনাকে জানিয়ে রাখলাম। তিনি জানালেন, কোনোচিন্তা করো না। আমি সব মিটিংগুলোতে যোগ দিতে পারব আল্লাহ চাহে।

১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৩

তিনি নিউ জার্সিতে এলেন মিসিগানে থেকে প্লেনে নিউ জার্সির নিউ ইয়ার্ক এয়ারপোর্টে। সে দিন ছিল হাড় কাপানো কনকনে শীত। তবুও খালাম্মাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে নিউ ইয়র্ক থেকে উপস্থিত হয়েছেন কাজী জাকারিয়া। ফরাশত আলী, আবু তালেব, হানিফ, রাফায়েত চৌধুরী নাজমুল হক হেলাল, কাওসার, দিলীপ নাথ এবং আরও কয়েকজন। আমি ও বকুল আগেই এয়ারপোর্টে পৌছে যাই। ভিতরে গিয়ে ওনাকে রিসিভ করার জন্যে অপেক্ষা করি। দেখছি উনি

হুইল চেয়ারে বসে আমাদের দিকে আসছেন। আমরা দৌড়ে গিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে উনাকে অভ্যর্থনা জানালাম। আমাদের দেখে খুব খুশী হলেন। বাইরে এসে দেখি জাফর ইকবাল সহ নিউ ইয়র্কের নেতৃবৃন্দ ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। সবাই উনাকে ফুলে স্বাগত জানালেন। খালাম্মা খুব খুশী হলেন সবাইকে পেয়ে। আমরা সবাই মিলে উনার সাথে ছবি উঠালাম।

এয়ারপোর্টে খালাম্মাকে এই অভ্যর্থনা জানানোর দৃশ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেকে ভাবছিল কে এই মহিলা হুইল চেয়ারে বসে। কেন এত আনন্দ উচ্ছাস। অনেকে জিজ্ঞেস করতে দ্বিধাবোধ করল না। উনি কে? আমরা গর্বিত হয়ে উনার পরিচয় দিলাম। আমাদের জাতীয় নেতা।

খালাম্মাকে নিয়ে আমাদের বাসায় এলাম। নিউ ইয়র্ক থেকে যারা এসেছিলেন,তারাও এলেন। ওখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, সবাই জাহানারা ইমামকে খালাম্মা সম্মোধন করতাম। আমাদের মধ্যে কাজী জাকারিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর সাথে পরিচয় হতেই জাহানারা ইমাম বললেন, আমি আপনাকে জাকারিয়া ভাই বলব। আশা করি আপনার কোনো আপত্তি থাকবে না। জাকারিয়া ভাই বললেন, আমার কোন আপত্তি নেই। আমি ও আপনাকে আপা সম্মোধন করব। আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

সে রাতে খালাম্মা খুব ভালো মুডে ছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করলেন আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে। আমরাও আমেরিকায় আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ দিলাম। আড্ডা শেষে নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্কে চলে গেলেন। খালাম্মাকে আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচি জানালাম। বিশ্রাম এবং অনুষ্ঠান মিলে ওনার কর্মসূচি। ঘুমাতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, সেটা দেখা যাবে। আমি এখন তোমাদের ছেলেদের সাথে গল্প করব।

আমাদের বড় ছেলে মুশফিক নবী, ডাক নাম বনি। বয়স তখন ১৩ বছর। ছোট ছেলে আদনান নবী, বয়স তখন পাঁচ বছর। ওদের সাথে গল্প ভালো জমে উঠেছিল। ঐ বয়সের ছেলেদের সাথে কি গল্প করতে হবে, তিনি জানতেন।

ডিসনী ওয়ার্ল্ড কাটুন ছবি সব বিষয়ে ওনার জানাছিল। আমরা উনার এই বহুমুখী প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলাম। বকুল ইতিমধ্যে খালাম্মা কি খেতে পারেন, কোন খাবার পছন্দ করেন, তা জেনে গেছে। আমরা খালাম্মার ছেলে জামী এবং পুত্র বধু ফ্রিদার সাথে কথা বলে এ তথ্য জেনেছি। এ বিষয়ে আমরা খুব সতর্ক ছিলাম।

১৯৯০ আমাদের ছেলে আদনানের আকিকা অনুষ্ঠানে এসে খালাম্মা কিছুই খেতে পারেন নাই। উনার জন্যে নরম এবং মশলাবিহীন খাবরের কোনও ব্যবস্থা ছিলনা। সে জন্যে এবার বুকল আগেই খালাম্মার জন্যে প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করেছে।

জাহানারা ইমাম এই প্রথম আমেরিকায় এসেছেন সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে। এর আগেও তিনি বহুবার এখানে এসেছেন। এখন তার পরিচয় ছিল শহীদ জননী, লেখক ও শিক্ষাবিদ। এবার তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এক জাতীয় নেতা। গণআদালতে পেলাম আজমকে তার যুদ্ধাপরাধের জন্য ফাঁসির রায় দিয়েছেন। তিনি আবার নূতন প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বাস্তবায়নের জন্যে। তাই আমাদের কমিটির নেতা ও কর্মীবৃন্দের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা। এসব বিবেচনা করে আমরা নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে জাহানারা ইমামকে গণসম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছি। জানুয়ারী ১৭ তারিখে রোববার। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। চলছে চারদিকে গণসংযোগ। এ প্রচেষ্টায় নেতৃত্বে দিচ্ছেন আমাদের সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ফরাশত আলী। সাথে আছেন ব্রুকলীনের হানিফের নেতৃত্বে আরও অনেকেই।

ফরাশত আলী শহীদ পরিবারের সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের তার বড় ভাই শহীদ হয়েছেন। তিনি ছাত্র জীবনে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন সিলেট জেলায়। ইংল্যান্ডের টেক্সটাইল টেকনোলজিতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে আমেরিকার স্থায়ী ভাবে বাস করছেন। গণতন্ত্রী পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদিক ছিলেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে NRB Commercial Bank-এর চেয়ারম্যান।

ফরাশত আলীর সাংগঠনিক ক্ষমতা অসাধারণ। তার জনবল রয়েছে। তার পরিবারের অনেক সদস্য আমাদের সমন্বয় কমিটির নিবেদিত প্রাণ কর্মী। ফরাশত আলী ও হানিফের নেতৃত্বে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় জাহানারা ইমামের গণসম্বর্ধনার প্রস্তুতি এগিয়ে চলছিল।

জাহানারা ইমাম আমাদের বাসায় এসেছেন, এ খবর আমাদের সমিতির সদস্যদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল? অনেকেই দেখা করতে চান। তাই একটি গেট টুগেদারের আয়োজন করলাম। ৯১ এ তিনি নিউ জার্সি বাংলাদেশ সমিতির অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। অনেকেই চিনেন। অনুষ্ঠানে অনেকেই এসেছিল। অনেক গল্প হলো। পূর্ব পরিচিতদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার তিনি খুশি হলেন। অনেকেই উনার সাথে ছবি তুললেন। অনুষ্ঠানের শেষে খালাম্মা জিজ্ঞেস করলেন। নবী-ওরা কেউ তো আমাকে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সমন্বয় কমিটির আন্দোলনের কথা জিজ্ঞাস করল না। ওরা কি যুদ্ধাপরাধীদের কথা ভুলে গেছে?

জাহানারা ইমামের গণসম্বর্ধনা রোববার বিকেলে। আমরা দুপুরে রওনা হব। সকালে খালাম্মা-শাওয়ার নিচ্ছেন। আমি সকালেই তৈয়ারী হয়ে আছি। কম্পিউটারে কি যেন কাজ করছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। আমি আমার বড় ছেলে বনিকে ফোন ধরতে বললাম। বনি ফোন উঠিয়ে হ্যালো বলার পর আর ওর কথপোকথনের কোন শব্দ শুনতে পারছিলাম না, প্রায় এক মিনিট নীরবতা।

তার পরে উচ্চস্বরে বলে উঠল, Dad. Come here. A crazy guy is on the phone. I do not understand what he is saying. এ সব শুনে আমি কম্পিউটার ছেড়ে এসে ফোন ধরলাম। অপর প্রান্তে এক বাঙ্গালি অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ শুনার পর বললাম আপনি কে বলছেন? কাকে চাচ্ছেন? আমার কণ্ঠস্বর শুনে গালির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। ঔসব গালি এখানে লেখা যাবে না। শেষে সে বলল, জাহানারা ইমাম ও তোর জন্যে দুটি বুলেট তৈয়ারী আছে। আজ যদি জাহানারা ইমামকে নিয়ে ব্রুকলীনে গসসম্বর্ধনায় আসিস, লাশ হয়ে নিউ জার্সি ফিরতে হবে। আমি ফোন রেখে দিলাম। আবার বেজে উঠল। ধরলাম না। ছেলেকে বললাম, Crank Call,.Let's ignore it. আমাদের ছেলে বনি মাত্র ১৩ বছর বয়স। তখনো বাংলা ভালোভাবে শিখে নাই। গালিগালাজ তো দুরের কথা। তাই রক্ষা। খালাম্মা ও বকুলকে এই ফোনের কথা জানালাম না। আমি ফোনের হুমকিতে বিচলিত হলাম না। মুক্তিযুদ্ধে কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। কত ঝুকি নিয়েছি। সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়েছেন। কিন্তু এখানে জাহানারা ইমামের নিরাপত্তা জড়িত। আল্লাহ না করুক, পাছে যদি কিছু হয়। তাহলে জাতীর কাছে আমরা কি জবাব দিব।

নিউ ইয়র্ক তথা আমেরিকায় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি তথা আলবদর, রাজাকার যুদ্ধাপরাধীর উপস্থিতি আমাদের জানা আছে। আর্থিক এবং সাংগঠনিকভাবে ওরা বেশ শক্তিশালী। বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী যুদ্ধাপরাধী আশরাফুজ্জামান খান নিউ ইয়র্কে বাস করে। কিন্তু এসব সত্বেও ওরা যে হুমকি দিল, সেটা নিছক হুমকি। সত্যিকারে এ রকম ঘটনা যারা ঘটাবে তারা ফোনে হুমকি দিবে না। তবু আমি ফরাশত আলীকে এ ফোনের কথা বললাম। তিনি বললেন, চিন্তা করবেন না। আমরা খালাম্মার সব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি। আমাদের স্বেচ্ছা সেবকবৃন্দ রেডি। আমরা অনেক কয়টা ওয়াকি টকি ভাড়া করেছি। হানিফ ও ফরাশত আলী ওয়াকি টকির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন এবং গণসম্বর্ধনায় প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে।

জাহানারা খালাম্মাকে নিয়ে আমি ও বকুল আল্লাহর নাম নিয়ে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলীনের পথে রওনা হলাম। সে সময় আমি সাদা ক্যাডিলাক গাড়ী চালাতাম। ছাদের উপরে লাল রং এর আচ্ছাদন, দেখতে কনভারটেবল গাড়ি-মনে হয় অর্থাৎ কনভারটেবল ছাদ। এটাকে সিমুলেটেড কর্নভারটেবল ছাদ বলাই হয়। আমার গাড়িটি নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক মহলে সবাই চিনে। দূর থেকে সহজেই নজরে পরে। সে দিন মনে হয়েছিল, আজ এ গাড়িটা ব্যবহার না করতে পারলে ভালো হতো। অন্য গাড়ি-থাকলে সহজে লোকে চিনতে পারবে না।

গণ-সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ব্রুকলীনের একটি স্কুল মিলানায়তনে। স্কুলের কাছে পৌছানের দু ব্লক আগে লোকে লোকারন্য। আমার

গাড়ি দেখতেই জাহানারা ইমামের নামে শ্লোগান। দেখছি আমাদের নেতৃবৃন্দ ওয়াকি টকি হাতে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। কাজী জাকারিয়া, ফরাশত আলী হানিফ ও আরও অনেকে এসে গাড়ি ঘিরে রেখে স্কুলের ঢোকার দরজায় নিয়ে গেল। জাহানারা ইমাম গাড়ি থেকে নামতেই চারদিকে ব্রুকলীনের আকাশ বাতাস কাপিয়ে শ্লোগানে শ্লোগানে জাহানারা ইমামকে স্বাগত জানালো। লক্ষ্য করলাম জাহানারা ইমামের চারদিকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের ইস্পাত কঠিন বেষ্টনি।

জাকারিয়া ভাই, ফরাশত ভাই ও আমি জাহানারা ইমামকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করলাম। প্রথমেই ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা। নিউ ইয়র্কের সবধরণের সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষ, মহিলা, পুরুষ যুবক সকলেই ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো। ফুলের তোড়া এত দেওয়া হয়েছিল যে যখন জাহানারা ইমাম আসন গ্রহণ করলেন, ফুলের তোড়ার জন্যে উনার মুখ দেখা যাচ্ছিল না ফটো সাংবাদিকগণ অভিযোগ করলেন। জাহানারা ইমামের ছবি তুলতে পারছি না উনার মুখ ফুলের তোড়া আড়াল করেছে। আমরা কিছু ফুলের তোড়া সারা টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে উনার মুখকে উন্মুক্ত করে দিলাম। অনুষ্ঠান শুরু হলো। কাজী জাকারিয়া ভাই সভাপতিত্ব করলেন। আমি মানপত্র পাঠা করলাম এবং উনাকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট দিয়ে অভ্যর্থনা জানালাম। ফরাশত আলী সভা পরিচালনা করলেন। সভাস্থলে নিউ ইয়র্কের সর্বস্তরের মানুষ এসেছে। মিলনায়তন কানায় কানায় ভয় গেছে। দর্শক বসার জায়গা না পেয়ে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এই প্রথম নিউ ইয়র্কে এমন স্বতফূর্ত গণসম্বর্ধনা দেখছি।

আমাদের সমন্বয় কমিটি নেতৃবৃন্দ, সকাল রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্টব্যাক্তি বর্গ জাহানারা ইমমামের প্রতিশ্রদ্ধা জানালেন। তার নেতৃত্বের প্রশংসা করলেন। গণআদালত সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। সবাই আশা প্রকাশ করলেন, বাংলাদেশের সব রাজাকারের বিচার হবে এবং একদিন বাংলাদেশ রাজাকার মুক্ত হবেই। অনেকেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কঠোর সমালোচনা করল যুদ্ধাপরাধীদেরকে মন্ত্রী বানানোর জন্যে এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে। সবাই জাহানারা ইমামের সুস্বাস্থ কামনা করলেন। অনেকেই জাহানারা ইমামকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থক রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করলেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল। সমাবেশে প্রচুর মহিলা এবং শিশু কিশোরের উপস্থিতি এবং মুর্হুমূহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শ্লোগান। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ তীক্ষ্ম নজর রেখেছিল চারদিকে। জাহানারা ইমাম মঞ্চে বসে মনোযোগ দিয়ে সবার বক্তব্য শুনছিলেন। স্থানীয় বক্তাদের বক্তব্যের শেষ দিকে জনতা জাহানারা ইমামের বক্তব্য শুনার জন্যে শ্লোগান দিচ্ছিল। স্থানীয় বক্তার সংখ্যা আর না বাড়িয়ে

জাহানারা ইমামকে অনুরোধ জানানো হলো তার বক্তব্য পেশ করার জন্যে।

তিনি বসেই বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমেই শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। সমবেত জনতাকে ধন্যবাদ জানালেন এই শীতের মধ্যে আসার জন্যে। তিনি তার বক্তৃতায় নির্মূল কমিটির আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরলেন। সরকারি অপপ্রচার খণ্ডন করে তিনি বলেন আমরা আইন হাতে তুলে নেই নি। আমরা আন্দোলন করেছি ঘাতকদের বিচারের জন্যে। গণআদালত হলো প্রতীকী আদালত। তিনি বলেন, জিয়া সরকার গোলাম আযমকে সাদরে বরণ করে দেশে থাকতে দিয়েছেন। এর পূর্ব পর্যন্ত ঘাতক রাজাকারেরা ইদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে ছিল। গোলাম আযম বাংলাদেশে আসার পর তারা একে একে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। গত ১৫ বছরে সরকারি মদদে ঘাতকরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছে। ৭৩ সালে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়, জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অথচ জিয়া সরকার ঐসব নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। জাহানারা ইমাম বলেন, আজ ঘাতক-জামাতরা সংসদে ১৮টি আসন পেলো। ভবিষ্যতে আরও পাবে এবং ক্রমে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে সেটা যেকোনো ভাবে রুখতে হবে। জাহানারা ইমাম আক্ষেপ করে বলেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর বিএনপি জামাতের সহযোগিতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। তাই তাদের রক্ষা করে ঋণ শোধ করছে। তিনি বলেন, আমি যুদ্ধে নিজ সন্তান হারিয়েছি, স্বামীকে হারিয়েছি। আমি ৩০ লক্ষ সন্তান হারা মায়ের দুঃখ, কষ্ট, ঘৃণা বুঝতে পারি। সেই চেতনা থেকে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ছেলে রুমীকে হারিয়েছি। আজ দেশে আমার কোটি সন্তান রয়েছে। আমি আজ দেশের কোটি মানুষের ভালোবাসার দাবিদার। তিনি ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে নির্মূল কমিটির যুক্তরাষ্ট্র শাখাসহ প্রবাসীদের স্বতস্ফূর্ততায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আপনাদের সহযোগিতা আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলবে। তিনি আরও বলেন। আজ সময় এসেছে মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। এর কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, আজ সময় এসেছে ঘাতক-দালালদের মূল উদপাটন করার। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো সময়সীমা নেই। তাই আমাদের আন্দোলন চলবে যত দিন না বাংলাদেশের সকল যুদ্ধাপরাধীদের সাজা পাবে। যতদিন বাংলাদেশ রাজাকার মুক্ত হবে। তিনি সবার দোওয়া কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

আগেই বলেছি, এ গণসম্বর্ধনায় নিউ ইয়র্কের সর্বস্তরের জনগণ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের প্রতি ফুলে শুভেচ্ছা জানালেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টির যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি গজনফর আলী চৌধুরী, সাহিত্যিক ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ আলম, সংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, জাসদ ইনু যুক্তরাষ্ট্র শাখার

সভাপতি মোসাব্বির, বাঙ্গালি চেতনা মঞ্চের আব্দুর রহিম বাদশা, প্রজন্ম একাত্তরেই দিলীপ নাথ, নিউ জার্সির আওয়ামী লীগ সভাপতি এম এ খালেক, তাহের স্মৃতি সংসদের সভাপতি এডভোকেট মজিবর রহমান, কমিটি ফর ডেমোক্রসি ইন বাংলাদেশ এর দুই কমিটির সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এম এ তালেব ও ফখরুল আলম, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ সরকার, আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের আব্দুল মোসাব্বির, বাংলাদেশ সোসাইটির বিদায়ী সভাপতি আওলাদ হোসেন খান, বাংলাদেশ ফোরামের হাসান ইমাম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শামসুদ্দিন আজাদ প্রমুখ।

সভার শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় শহীদদের স্মরণে। এর আগে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মঞ্চে এসে উপস্থিত হলে দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানায়। সভার শুরুতে মোট ২১টি সংগঠন ফুলের তোড়া দিয়ে নেত্রীকে স্বাগত জানান। সংগঠন সমূহের মধ্যে ছিল–সমন্বয় কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখা, বিয়ানী বাজার যুব সংঘ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা, জাসদ ইনু যুক্তরাষ্ট্র শাখা, দৈনিক খবর ব্যুরো, তাহের স্মৃতি সংসদ, বাঙ্গালি চেতনা মঞ্চ, সিলেট গণদাবী পরিষদ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং আরও অনেক সংগঠন। সেদিনের এ অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করতে ব্রুকলীনের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল, হানিফ, বাফায়েত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম নজী, এ বি সিদ্দিক, চন্দন, লুৎফুর, হাজী শফি প্রমুখ। দু ঘন্টা ব্যাপি সভাশেষে আমরা আবার স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা বেষ্টিতে হয়ে গাড়িতে উঠলাম। ফেরার পথে ম্যানহাটনে ফরাশত আলীর মালিকানাধীন গ্রেট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট এ ডিনার খেয়ে নিউ জার্সিতে বাসায় ফিরলাম।

জাহানারা ইমাম গণসম্বর্ধনায় স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা ও ভালোবাসা পেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। গণ আদালতের সাফল্যের পর প্রবাসে এই গণসম্বর্ধনায় তিনি ভগ্ন শরীরে শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। যুদ্ধারাধীদের বিচারে প্রত্যয় আরও বেড়ে গেল। জাহানারা ইমাম বাড়িতে ফিরে এসে বললেন, নবী, প্রবাসীরা যে আমাকে এত ভালোবাসে, তা আগে জানতাম না। আমি বললাম খালাম্মা। এ ভালোবাসা আপনি অর্জন করেছেন।

গণসম্বর্ধনার পরের দিন খালাম্মাকে নিয়ে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে অবস্থিত সাপ্তাহিক প্রবাসী পত্রিকা অফিসে গেলাম। সৈজন্য সাক্ষাতকারও মতবিনিময় ছিল মূলউদ্দেশ্য। সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ এবং জাহানারা ইমাম পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। পূর্ব পরিচিত। সেখানে প্রবাসী পরিবারের আরও দুজন উপস্থিত ছিলেন। লেখক ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এবং ড. মুশতাক ইলাহী। ড. মুশতাক ইলাহী একজন মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সন্তান। তাঁর ছোট ভাই মুক্তার ইলাহী

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমরা চারজনে অনেক আলাপ আলোচনা করলাম। জাহানারা ইমাম প্রবাসী পত্রিকার এরশাদ বিরোধী ভূমিকা এবং মুক্তিযুদ্ধ পক্ষের সদাসর্বদা জোরালো ভূমিকার প্রশংসা করলেন। মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এরপর জাহানারা ইমমের নিকট আত্মীয় বেবী এবং তার স্বামী মিলনের বাসায় যেতে চাইলেন। বেবী ছাত্রদলের নেত্রী এবং মিলন বিএনপির যুবনেতা। কিন্তু আত্মীয়। তাই কোনো সংকোচনা না করে আমরা ওদের ব্রুকলীনের বাসায় গেলাম। মিলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। ফেরার পথে ওনার ভাগনি রুবিনা ও তা স্বামী-জাবেদ এর বাসায় গেলাম। এত ব্যস্তার মধ্যে তিনি পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে ভুললেন না। রুবিনা ও জাবেদ আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

সারাদিন নিউ ইয়র্কের উপরোক্ত দুটি জায়গায় সময় কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলায় নিউ জার্সিতে বাড়ি।

গত রবিবারে গণসম্বর্ধনায় প্রশ্নোত্তরের কোন সুযোগ ছিল না। সাংবাদিকবৃন্দ অনুরোধ জানিয়েছিল জাহানারা ইমামের সাথে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে। সে মোতাবেক পরের শনিবারে নিউ ইয়র্ক এর এসটোরিয়াতে আমরা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করি। স্থান রিফরম চার্চ। এ সাংবাদিক সম্মেলনে বকুল যেতে পারল না। আমাদের ছোট ছেলে আদনানের শরীরটা ভাল ছিল না। খালাম্মা নিরাশ হলেন। বললেন, বকুল সাথে থাকলে আমার সুবিধা হয়। কখন কি লাগবে, কি খেতে হবে, বকুল সে সব খেয়াল রাখে। জাহানারা ইমাম প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের বাসায় ছিলেন। এখানে আসতেই জাফর ইকবাল খালাম্মাকে ওদের বাসায় এক রাত কাটাত আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। খালাম্মা রাজী হয়েছিলেন। বলাছলেন, নবীর বাসায় থেকে সব সাংগঠনিক কাজ শেষ করে মিসিগানে ফেরার আগের রাত জাফরের বাসায় কাটাবে। পরেরদিন মিশেগানে ফিরে যাবেন। সে মোতাবেক ঠিক হয়েছিল, খালাম্মা নিউইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলন করে জাফরের বাসায় সরাসরি যাবেন। ওখান থেকে মিসিগানে চলে যাবেন। জাফর ইকবাল আমাদের সাথে নিউইয়র্কের সাংবাদিক সম্মেলনে যাবেন। তাই সকালে আমাদের বাসায় এল। আমি জাফর ইকবাল ও খালাম্মা নিউইয়র্কে রওনা হল। বকুল সাথে না গেলেও আমার কাছে খালাম্মার জন্যে, পানি ইউগুট দিতে ভুলে নাই। আমরা পৌছে দেখি সাংবাদিকবৃন্দ এসে গেছেন। নিউ ইয়র্কের কোন সাংবাদিক অনুপস্থিতেই। আমাদের সমন্বয় কমিটির সব নেতৃবৃন্দ ও সেখানে উপস্থিত আছেন। জাহানারা ইমাম দীর্ঘ দু ঘন্টা সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল তীর্যক। কিন্তু তিনি আস্তে ধীরে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ওনার আবেগের কোন বহির বহিঃপ্রকাশ পেল না। শান্ত গলায় উত্তর দিলেন। কোন বাড়তি কথা না বলে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। তিনি

এক নাগাড়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরতি দিলেন এবং একটু ইউগুটি ও পানি খেয়ে নিলেন। আরও এক ঘন্টা কথা বললেন। একটু একটু কাশি হচ্ছিল। কিন্তু কাশি চেপে থাকার চেষ্টা করছিলেন। আমি, কাজী জাকারিয়া ফরাশত আলী জাহানারা ইমামের সাথে মঞ্চে বসে ছিলাম। আমি ওনার পাশেই ছিলাম। মাঝে মাঝে পানি এগিয়ে দিচ্ছিলাম। জাহানারা ইমাম মতবিনিময় কালে প্রবাসীদের কাছে আবেদন রাখলেন, গোলাম আযমের বিচারের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে লবিং করে সরকারের চাপ দেওয়ার জন্যে। মুক্তিযুদ্ধের সকাল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে রাজাকারমুক্ত এবং যুদ্ধাপরাধীমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্যে। জাহানারা ইমাম সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

নিচে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল। ২১ বছর আগে কে কি করেছে এটা নিয়ে জাতিকে বিভক্ত না করে দেশ গড়ার ব্যাপারে একটি ঐক্যের সোপান কেন বচনা করছেন না? এ প্রশ্নের জবাবে জাহানারা ইমাম বলেন, এ চিন্তাই ভ্রান্ত। যারা রাজাকার আলবদর, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য এখনও অনুতপ্ত নয়। দেশগড়ার কাজে যদি তারা আগে যোগ দিত তাহলে এটা হতোনা। এই মুহূর্তে দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন দেশ রাজাকারের শাসন, করবে না মুক্তযোদ্ধারা শাসন করবে। এই জন্যেই আমাদের আন্দোলন। আর আমরা ওই আন্দোলন অব্যাহত রাখব। ১৯৭৫ এর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার না করে ভুল করেছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিছনের ইতিহাস নিয়ে আমরা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে চাই না। অনেক চীন পন্থীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করলেও তারা এখন আমাদের সহশক্তি। সুতরাং পিছনে কে কি করেছে এটা বড় কথা নয়। বর্তমান আন্দোলনে কার কি অবদান সেটাই দেখার বিষয়। জামাতকে নিঃশেষ করে ফেললে কি সাম্প্রদায়িকা শেষ হয়ে যাবে এবং আপনাদের এই আন্দোলন কি সরকার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে না? এর জবাবে তিনি বলেন। আপাতত জামাতই আমাদের টার্গেট। আর আমাদের আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে নয়। সরকারই জামাতকে সহযোগিতা করে আমাদেরকে তার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সে সময়ে প্রায় বিশ হাজার পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে এটাকে অতিরঞ্জিত করলেও করতে পারে। বিএনপির মধ্যে তাদের সমর্থন কেউ আছে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আছে। যখন ড্রইং রুমে তাদের সাথে কথা হয় তখন তারা আমাদের সাথে একাত্মতা দেখালেও দলীয়নীতির কারণে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। এরপরও সরকারি দলের বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং কর্ণেল আকবর সংসদে আমাদের পক্ষে কথা বলেছে। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরী একজন কট্টর জামাত পন্থী রাজাকার। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট নিজেই তো রাজাকার। ঐ আন্দোলনের কি ধরনের

প্রতিবন্ধকতা মুখোমুখি হচ্ছেন এর জাবাবে জাহানারা ইমাম বলেন, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা প্রতিবন্ধকতা আছেই। এর মধ্যে যেমন মিথ্যা মামলা, হুমকি, আমরা যেখানে সভা আহবান করি জামাত ছাত্রশিবির যুব কমান্ড একই জায়গায় এক সময়ে সভা আহ্বান করে আমাদের বাধাগ্রস্থ করতে চায়। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুচনা হয়েছে এবং অব্যাহত সামরিক শাসনের কারণে আমরা তখন আন্দোলন করতে পারি নি। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের বিচার হবেই। এজন্য সর্বশক্তি দিয়ে সবাইকে নিয়ে এই আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়েছি সর্বস্তরের লোকজনের সাড়া মিলেছে এবং এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। সাংবাদিক সম্মেলনে জাহানারা ইমাম আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

সম্মেলন শেষে আমরা নিউ জার্সির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গন্তব্য আমাদের বাসা নয়। জাফর ইকবাল বাসা। জাহানারা ইমাম জিজ্ঞেস করলেন, নবী সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক বলেছি তো? আমি ও জাফর বললাম, সবই প্রশ্নের উত্তর আপনি ঠিকভাবে দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস সাংবাদিকরা সবাই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরেছে। গাড়িতে উঠার সময় জাফর নিউ ইয়র্কে যাওয়ার মত সামনে আমার পাশে বসে পড়ল। জাহানারা ইমাম বললেন, জাফর তুমি পিছনে আমার পাশে বস। আমরা গল্প করব চোখে চোখ রেখে। নবী নিরিবিলিতে গাড়ি চালাতে পারবে। পিছনে দু লেখকের নানা বিষয়ে গল্প। কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়। বিশেষ করে জাহানারা ইমাম প্রথমে যখন আমেরিকায় আসেন উচ্চশিক্ষার জন্যে, সে সময়ের গল্প। আমি ড্রাইভ করেছিলাম আর পিছনের দুলেখকের গল্প শুনছিলাম। জাহানারা ইমামকে জাফরের বাড়িতে রেখে ঘরে ফিরলাম। দেখি ছোট ছেলে আদনান সকালের চেয়ে ভালো আছে। কম্পিউটার গেম খেলছে। পরেরদিন জাফরের বাসায় একটি গেটটুগেদার হয়েছিল। জাহানারা ইমাম প্রায় এক সপ্তাহ নিউ জার্সিতে কাটিয়ে মিশিগান ফিরেছিলেন। এবার জাহানারা ইমাম আমাদের বাসায় প্রায় এক সপ্তাহের উপরে অবস্থান করেন।

বকুল ও আমি তখন তরুণ পেশাজীবী বিজ্ঞানী। তার উপর আমাদের দুজন অল্প বয়সের ছেলে। ওদের অসুখ বিসুখ, আন্দোলনের কারণ ছুটি হিসাব করে নিতে হয়। তার উপর অফিসে জরুরি মিটিং থাকে এমতাবস্থায় সপ্তাহব্যাপী ছুটি নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু খালাম্মাকে একা বাসায় রেখে অফিসে যেতে মন চাইছিল না। অসুস্থ মানুষ, তার উপর ক্যান্সারের রোগী। তাই ভাবছিলাম, কি করা যায়। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল আমাদের সমন্বয় কমিটির আবু তালেব। ব্যাচলর তালেব নিউ ইয়র্ক থেকে আমাদের বাসায় এল। দিনের বেলায় খালাম্মার দেখাশুনা করবে। আর খালাম্মার সাথে রাজনীতি ও আন্দোলন নিয়ে

আলাপ করবে। তালেব এমনিতেই তাত্ত্বিক। গবেষণামূলক বই পড়তে পছন্দ করতো খালাম্মাকে দুপুরের খাবার গরম করে খাওয়াতে হত। বকুল ওকে শিখেয়েছিল। কিভাবে ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার বের করে মাইক্রোওয়েবে গরম করতে হবে। তালেব খুব উপভোগ করেছিল কয়েকদিন খালাম্মার সাথে থাকতে এবং দিনের বেলায় তাঁর সেবা করতে। খালাম্মাও কথা বলার একজন সঙ্গী পেয়েছিলেন।

ঘাতক সাঈদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্র সমন্বয় কমিটি একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে প্রবাসে সচেতনা বৃদ্ধির জন্যে অবিরত আন্দোলন করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দাবিতে সর্বদাই সোচ্চার ছিলাম। আমরা যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবিতে অনেকবার জাতি সংঘে সামনে সমাবেশ করেছি। গোলাম আযমের গণআদালতে বিচারের পর আমরা প্রবাসে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। গণতদন্ত কমিশন কর্তৃক অভিযুক্ত একাত্তরের ঘাতক দালাল বির্তকিত মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ঘন ঘন যুক্তরাষ্ট্রে এসে ওয়াজ মাহফিল করত এবং ধর্মভীরু প্রবাসী বাংলাদেশীর নিকট থেকে প্রচুর চাঁদা তুলতো। একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে তার বই, অডিও ভিডিও ক্যাসেট প্রচুর বিক্রি করত। সরল পুরুষ নারী বৃদ্ধ এই সব কিনে সাঈদীর পকেট ভরত। সাঈদী এতো জনপ্রিয় হয়েছিল। যে মহিলারা তার ওয়াজ শুনে তাদের গয়না সাঈদীকে দান করত। আসলে এই ভণ্ড আলেম সে সব চাদা নিজের জন্যে এবং জামাতে ইসলামী পার্টির জন্যে খরচ করত। যদিও সে বলত প্রবাসীদের চাঁদা সে এতিমখানার ও মাদ্রাসায় দান করবে। আমরা এই ভণ্ড আলেম এবং একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী সাঈদীর আসল চেহারা উন্মুক্ত করার জন্যে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করি। সে যে সব স্থানে প্রকাশ্যে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করতো, সেখানে গিয়ে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করি এবং আগত মুছল্লিদের বোঝাতে চেষ্টা করি। সাঈদী একজন একাত্তরের ঘাতক, ধর্মব্যবসায়ী এবং জামাতে ইসালামের নেতা। সে প্রকৃত পক্ষে কোনো আলেম নয়। আমাদের এ প্রচেষ্টা সুফল আনতে শুরু করে। একবার সে একজন মহিলা ডাক্তারের বাসায় ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে। এ খবর পেয়ে আমাদের কয়েকজন নেতা সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সাঈদীর আসল পরিচয় জানায়। সাঈদীর এই ভক্ত তাতে সায় দেয় না। এখন আমরা তার বাসায় সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন হুমকি দিলো সে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অন্য মহিলা আসতে অপরাগতা জানায়। সাঈদীর ওয়াজ মাহফিল ভেস্তে যাব। আমাদের এ কর্মকাণ্ডের ফলে সাঈদীর দর্শক কমতে থাকে। চাঁদার পরিমাণ কমতে থাকে। শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেইট ডিপার্টমেন্ট সাঈদীর ওই আইনবর্হিভূত

চাদা উত্তোলনের কথা জানাই এবং তার ভিসা না দিতে অনুরোধ জানাই। তারপর আর সাঈদ যুক্তরাষ্ট্রে চাঁদা তোলার জন্যে প্রবেশ করতে পারে নাই। সাঈদীর বিরুদ্ধে ২২ জুন, ৯৪ এক বিক্ষোভ এর আয়োজন করি নিউ ইয়র্কে। বিক্ষোভের প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক বাঙ্গালী সহ নিউ ইয়র্কের সকল পত্রিকায়, নিচে সাপ্তাহিক বাঙ্গালির ২৪ জুন ১৯৯৪ সংখ্যার প্রতিবেদন তুলে ধরলাম। আমরা অনুরূপ ভাবে ঘাতক গোলাম আযম, মতিউর রহমানী নিজামী সহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ কালে বিক্ষোভ করেছিলাম। সাঈদীর বিরুদ্ধে আমরা এই বিক্ষোভটি আয়োজন করেছিলাম জাহানারা ইমামের মৃত্যুর মাত্র চার দিন আগে।

বিতর্কিত মওলানা সাঈদীর সমাবেশ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধিঃ গণতদন্ত কমিশণ কর্তৃক অভিযুক্ত এক্তারের ঘাতক দালাল বলে খ্যাত বিতর্কিত মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সমাবেশের সামনে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি উদ্যোগে প্রায় দুই শত ব্যক্তি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে লং আইল্যান্ড সিটি হাইস্কুলের সামনে। মুহূর্মূহু শ্লোগানে প্রকম্পিত আওয়াজ রীতিমত বেকায়দায় ফেলে দেয় সাঈদীর সমাবেশে আয়োজকদের। পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে থাকেন কয়েকটি ওয়াকিটকি নিয়ে। সাঈদীর অতি ভক্ত কিংবা তার স্নেহভাজন হওয়ার জন্য দুএকজন বিক্ষোভকারীদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য ছুড়লেও তা স্কুলের বারান্দায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। বিক্ষোভকারীরা সূর্য সৈনিকের মত বুক টান করে সমস্বরে আওয়াজ তুলেছে একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচারের দাবি জানিয়ে। বিক্ষোভ চলাকালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যৌথ আহ্বায়ক ড. নূরননবীর সভাপতিত্বে সদস্য সচিব ফরাশত আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা পর্ব। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এম এ সালাম, শোয়েব আহমদ, আবুল কাশেম শোভা, মো. শাহাবউদ্দিন , চন্দন সরকার, আবদুল মোছাব্বিন, রিয়াজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। রিয়াজউদ্দিন তার বক্তৃতায় বলেন, আমি এসেছিলাম এখানে কোরআনের তফসির শুনতে, কিন্তু ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির লিফলেট প্রকাশিত সাঈদী সম্পর্কিত তথ্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি এই অনুষ্ঠানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে আমরা এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শান্তপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। বক্তাগণ গণতদন্ত কমিশনার রিপোর্ট খুন, ধর্ষণ, ও লুটের অভিযোগে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে বয়কট করার জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে ড. নূরুন নবী বলেন, আমাদের বিক্ষোভ ইসলাম ধর্ম কিংবা পবিত্র কোরআন শরীফের তফসির অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়। আমরা বিক্ষোভ

করছি সেই ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ভাইদের হত্যা করতে এবং মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে পাক হানাদার বাহিনীতে সহায়তা করেছে। এই সমস্ত অপরাধীকে ইসলাম ধর্ম কখনও ক্ষমা করে না। ড. নবী শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্য সকলকে দোয়া করার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় কমিটি বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় মেলার আয়োজন করে। আমরা এখানে সে আদলে সারাদিন ব্যাপী বিজয় মেলার আয়োজন করি ১৯৯২ সালের বিজয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে। সারাদিনের অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠান। ছোটদের ছবি অংকন, কবিতা আবৃত্তি, নাচ গান ছাড়া ও ছিল মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গে ছিল আলোচনা সভা। ব্রুকলীনের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ থেকে আগত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আমাদের অনুষ্ঠানে আসেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা ছালাম উনাকে বিমান বন্দর থেকে তুলে আনেন। এ ছাড়াও সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দীন আহমেদ ও নাসিম আলী। সে অনুষ্ঠানে সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী অভিযোগ করেন আপনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করবেন আর জয় বাংলা শ্লোগান দিবেন না, সেটা হয় না।

এ বিষয়ে আমি পরে জাহানারা ইমামকে জিজ্ঞাস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন নির্মূল কমিটিতে মিটিং এ জয় বাংলা শ্লোগান নিষিদ্ধ নয়। যার ইচ্ছে দিবে, যার ইচ্ছে সে দিবে না। তিনি আরও বললেন, নির্মূল কমিটিতে কিছুলোক আছে, যারা মনে করে জয় বাংলা শ্লোগান আওয়ামী লীগের। কিন্তু তা সঠিক নয়। জয় বাংলা শ্লোগান ছিল স্বাধীনতার প্রতীক। ঐক্যের খাতিরে আমরা জয় বাংলা শ্লোগান বাধ্যতামূলক করি নাই।

১৯৯৩ এর বিজয় মেলার আয়োজন করেছিলাম নিউইয়র্কের এসটোরিয়াতে। সে আয়োজন ছিল এর আগের বছরের আদলে। এই বিজয় মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা জোহরা তাজউদ্দীন। সে অনুষ্ঠানের চমক ছিল, নিউ জার্সি বাংলাদেশ সমিতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক নাটক, অংশ গ্রহণে ছিল শিশু শিল্পীবৃন্দ। এ নাটকটি রচনা করেছিলে ড. জাফর ইকবাল। নাটকে পশ্চিম পাকিস্তান কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ করছে তা দেখানো হয়েছিল এভাবে। একটি শিশু অভিনেতার হাতে কার্ডবোর্ডে পশ্চিম পাকিস্তানের ম্যাপ এবং আর একজনের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ। তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তার পর হঠাৎ করে ম্যাপ দুটি উল্টিয়ে ধরে। দেখা যায় একটি কুমীর (পশ্চিম পাকিস্তানের ম্যাপ) পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করছে। জোহরা তাজউদ্দীন অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। তিনি বলেন ছোটদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ওরা সহজে বুঝতে পারে, সেভাবে সেখাতে হবে। এ নাটকে ১৯৬৯-৭০

এর আন্দোলন দেখাতে এক পর্যায়ে জনতার হাতে বঙ্গবন্ধুর পোস্টার নিয়ে তোমরা নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব শ্লোগানটিতে দিতে শিল্পীরমঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে মিছিল করে। এ দৃশ্য দেখে দর্শক করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

নিউ জার্সি বাংলাদেশ সমিতি ছোটদের এ নাটকটি গত সেপ্টেম্বর কানাডার মসট্রিলে বাংলাদেশ সম্মেলনে মঞ্চস্থ করে। সেখানেও বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে স্টেজে মিছিল দেখে দর্শক বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। তখন একজন অতি বামপন্থী- নেতা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল নবী সেখানে যায়, শেখ মুজিবের কাল্লা দেখায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশ যেখানে যাবে সেখানেই শেখ মুজিব থাকবে।

ইদানিং মুক্তিযোদ্ধা, ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি সুস্পষ্ট ভাবে সব জায়গায় বলি, যে মুক্তিযোদ্ধা জয় বাংলা বলে না, বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মানে না এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় না, তারা আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধা নয়। তারা এককালে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, কিন্তু এখন আর নয়। যারা জয়বাংলা বলে, বঙ্গবন্ধুকে মানে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়, তারা চির কালের মুক্তিযোদ্ধা।

নির্মূল কমিটির ডিনারে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং তৎকালীন সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ম্যানহাটানে এক গণ সম্বর্ধনার আয়োজন করে। পরে আমরা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর সম্মানে একটি ডিনারের আয়োজন করি, ফরাশত আলীর মালিকানাধীন গ্রেট ইনডিয়া রেস্টুরেন্টে। অনুষ্ঠানের আগের দিন নিউ জার্সিতে পারিবারিক বন্ধু নাসরিনের বাসায় বারবিকিউ পার্টিতে ভলিবল খেলা ছিল। সবাই সৌখিন খোলোয়াড়। আমি ডেক এ বসে খেলা দেখছিলাম। আমার কোলে আমাদের ছোট ছেলে আদনান। আমাকে সবাই খেলতে বলছিল। ছেলের অজুহাত দিচ্ছিলাম, আমি বেবী সিটিং করছি। শেষে বকুল ছেলেকে কোলে নিয়ে আমাকে খেলতে পাঠাল। ব্যাকইয়ার্ডে লনে খেলা হচ্ছিল। মাঠে নেমেই আমাদের পাশে আসা বল দৌড়ে গিয়ে মারতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ডান হাতের কুনুই সরে গিয়ে উপরে উঠে গেল। ভীষণ ব্যথা। সরাসরি হাসপাতালে। ব্যথায় জান চলে যেতে চাচ্ছিল। ডাক্তার এসে গল্প করার ছলে কবজি ধরে জোরে হেচকা টান মারল। কুনুই এর হাড়টি নিচে নেমে যথাস্থানে বসে গেল। পেইন কিলার খেয়ে বাসায় আসলাম। কিন্তু গাড়ি চালাতে পারলাম না হাতে স্লিংগ। ডান হাত স্লিংগ এর মাধ্যমে গলায় ঝুলানো। বকুল তখন নূতন ড্রাইভার। কিন্তু

ভালভাবে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এলাম। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পরের দিন। ম্যানহাটানে যেতে হবে। শেখ হাসিনার সম্মানে ডিনার। ম্যানহাটানে গাড়ি চালানো দুঃস্বপ্নের মতো। যেকোনো সময় যেকোনো কিছু হতে পারে। সাধারণত গাড়ি চালকের নিউ ইয়র্কে অভাব। যাই হোক সেদিন অনেক সাহস করে বকুল গাড়ি চালিয়ে আমাকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। ওটা ছিল ওর প্রথম নিউ ইয়র্কে ড্রাইভ করার এডভেনচার। শেখ হাসিনার উপস্থিত হবার আগেই সেখানে হাজির হলাম। হাতে স্লিংগ দেখে নানা প্রশ্ন, সবাইকে পুরো ঘটনাটি বলতে হল। সেদিনের ডিনার পার্টিতে ফরাশত আলী ছিলেন আমাদের সবার হোস্ট। তিনি ব্যাক্তিগতভাবে সব কিছু তদারকি করলেন। আমাদের সাথে একান্তে বসার ফুরসৎ পেলেন না।

ডিনার শেষে বক্তৃতার পালা। শেখ হাসিনার টেবিলে আমি ছাড়াও বসেছিলেন, সমন্বয় কমিটির যৌথ আহ্বাহক কাজী-জাকারিয়া, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী-লীগ সভাপতি নূরুল ইসলাম অনু এবং শেখ হাসিনার সফর সঙ্গী আবুল হাসান চৌধুরী। বক্তৃতা পর্ব শুরুতেই সেখানে উপস্থিত হলেন জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু। হেড টেবিলে জায়গা নেই। প্রটোকল হিসাবে জাকারিয়া ভাই ও আমাকে থাকবে হবে। অনুভাই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমাদের অতিথি। আর একটি চেয়ার যোগ করার কোনো জায়গা নেই। আমরা কি করব ভাবছিলাম। এমন সময় শেখ হাসিনা মুচকি হেসে কানে কানে বললেন। নবী সাহেব ছোট দলের বড় নেতা এসেছেন। উনাকে ডেকে বসতে দেন। আমাদের কথোপকতন আবুল হাসান চৌধুরী শুনেছে। তিনি বললেন, নবী-ভাই আমি সামনের চেয়ারে বসছি। আপনি ইনু ভাইকে ডাকেন। ইনু সাহেব আমাদের টেবিলে বসলেন। শেখ হাসিনা সমন্বয় কমিটির কাজে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন সমর্থন করলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতে হবেই হবে বলে দৃড় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার চাইলেন। তিনি আরও বললেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবেই।

এ অনুষ্ঠানে দুটি ঘটনা ঘটেছিল। খাবার সময় আমি বা হাত দিয়ে কাটা চামচের সাহায্যে মাংস খেতে পারছিলাম না। তিনি সেটা দেখতে পেয়ে, আমাকে বললেন, নবী সাহেব, এভাবে চলতে থাকলে আপনাকে খাবার না খেয়েই উঠতে হবে। আমাকে দেন আমি কেটে দিচ্ছি। তিনি চাকু এবং ফরক দিয়ে আমার খাবারগুলো কেটে ছোট ছোট টুকরো করে দিলেন। আমি খাবার শেষ করলাম। আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। শেখ হাসিনা সে সন্ধ্যায় একটু কাশি এবং গলার ব্যথায় ভুগছিলেন। এসে আদা চা চাইলেন। অনুষ্ঠানের শেষে ফরাশত বললেন, আপা, আপনাকে আদা কেটে দেই। সঙ্গে রাখেন, দরকার হলে খেতে পারবেন।

রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার কাটা আদা এনে একটি প্যাকেটে অনুভাইয়ের হাতে দিতে যাচ্ছিল, নেত্রী সেটা লক্ষ্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার জিনিস আনু ভাই কেন বহন করবে। উনি সম্মানি লোক। আমাকে দেন। ম্যানেজারের কাছ থেকে সেটা নিয়ে নিজ ব্যাগে রাখলেন। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা। একাধারে দলীয় নেত্রী, মা, বোন এবং সর্বোপরি জননেত্রী। তিনি একজন সংবেদনশীল মহিলা বলেই আমার খাবার কাটতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আনুভাইকে তাঁর ব্যাক্তিগত জিনিস বহন করতে দেন নাই। তিনি নেতা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান দেখাতে কখনো ভুলেন না।

নিউ জার্সিতে ১৯৯৪

জাহানারা ইমাম চিকিৎসার জন্যে ১৯৯৩ অক্টোবরে আবার মিশিগানের এলেন। আমি আগেই বাংলাদেশে উনার সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি আবার ও জানালেন নিউ জার্সিতে আসবেন। আমরা যেন উনার জন্যে আমেরিকার মূলধারার সাথে কিছু সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি।

ফোনে কথা হল। কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অস্পষ্ট শোনালো। তিনি নিজেই বললেন। স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। দেখি ডাক্তার কি বলে। তার পর তোমাদেরকে জানাব কবে নাগাদ তোমার ওখানে আসতে পারব। আমি উনাকে জানালাম আপনার জন্যে কয়েকটি কর্মসূচি আমি প্রস্তুত করেছি। আপনার শরীর ঠিক হলে ওগুলি কনফারম করব।

জামী জানালো, ডাক্তার পরীক্ষা করেছে। মার শরীর ভাল না। ক্যান্সার বেড়েছে। মাকে রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হবে। ভাবলাম, রেডিয়েশন থেরাপি তে শরীর দুর্বল হবে। কিন্তু ক্যান্সারের উন্নতি হবে। এর ফল খালাম্মার জন্যে ভাল হবে। রেডিয়েশন থেরাপির পর জানুয়ারি মাসে তিনি নিউ জার্সিতে আসতে চাইলেন। আমি জাতিসংঘ স্টেট ডিপার্টমেন্টে ও ওয়াশিংটনে ডিসিতে একটি সমাবেশের আয়োজনের ব্যবস্থা করলাম। ১৮ জানুয়ারি প্রচণ্ড শীতের সন্ধ্যায় তিনি মিশিগান থেকে নিউ জার্সিতে এলেন। বকুলও আমি নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে উনাকে নিয়ে বাসায় এলাম। এবার খালাম্মাকে প্রায় একবছর আগের তুলনায় অনেক দুর্বল মনে হল। বুঝতে পারলাম জামী কেন আমাদের এখানে উনাকে আসতে এবার খুব উৎসাহ দেখায় নি।

আমাদেরকে পেয়ে উনি যেমন খুশি। আমরাও তেমনি খুশী হলাম।

ইতিমধ্যে আমরা প্লেইনসবোরোতে নূতন বাড়ি বানিয়েছি এবং নূতন বাড়িতে উঠেছি। বাড়িটি আগের বাড়ির তুলনায় বেশ বড়। নূতন বাড়ি দেখে তিনি পছন্দ করলেন। খালাম্মা কি ধরনের খাবার পছন্দ করেন এবং খেতে পারেন বকুল ইতিমধ্যে জানে। সে সব খাবার তৈয়ারী করেছিল। উনাকে ক্লান্ত দেখতে পেয়ে

তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে চাইলাম। খালাম্মার জন্যে আমাদের বাড়ির গেস্ট রুমটি ঠিক করা হয়েছে। এই গেস্ট রুমটি এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি এপার্টমেন্ট এর মত। শোবার ঘরের পাশে আলাদা বসার ঘর। বেডরুম সংলগ্ন বাথরুম। আমরা ভেবেছিলাম খালাম্মা এখানে নিরিবিলিতে ঘুমাতে পারবেন ছেলেদের হৈ চৈ এ ডিস্টার্ব হবেন না। গেস্ট রুমটিতে খালাম্মাকে নিয়ে গেলাম। সঙ্গে লাগেজ। খালাম্মা রুমটি দেখে বললেন, আমি এখানে ঘুমাতে পারব না। আমি তোমাদের পাশের রুমে ঘুমাবো। বাড়ির মূল অংশে দোতালায় চারটি বেড রুম। খালাম্মা এই চারটি বেড রুমের একটির কথা বলেছিলেন। গেস্ট রুমটি বাড়ির মূল অংশের নিচের তলা থেকে সিড়ি বেয়ে দোতালায় উঠতে হয়।

তিনি বললেন, আমি অসুস্থ মানুষ। রাতে যদি আরও অসুস্থ হই, তোমাদেরকে ডাকব কি করে। তোমারা তো জানতেই পারবে না আমার কি হলো। হয়তো সকালে উঠে দেখবে আমি নেই। হেসে হেসে কথাগুলি বলছিলেন। আমরা বললাম, খালাম্মা কোন সমস্যা নেই। আপনি আমাদের পাশের রুমেই থাকবেন। খালাম্মা যে রসিকতা করতে জানেন, তা অনেকেই জানেন না।

আমাদের এই নূতন বাড়িতে আগের বাড়ির ফার্ণিচার বসেয়েছি। নূতন ফার্ণিচার কেনার সময় পাই না। আর জরুরি প্রয়োজন নেই। পুরানো যা আছে তা দিয়ে আমাদের চার জনের জন্যে চলে যাচ্ছিল। বেশ কয়েকটি কক্ষ তখনো খালি। তাই খালাম্মাকে ছোট ছেলে আদনানের রুমে নিয়ে এলাম। আমাদের বেড রুমের একটি রুম পরেই। তিনি রুমটি দেখে খুশি হলেন। বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন, বকুল, শোন, তোমাদের উচিৎ ছিল এই রুমে ছেলের জন্যে একটি ডাবল বেড কেনা। কারণ যখন ছোট ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয় তখন ওরা মায়ের পাশে ঘুমাতে চায়। আমি জানি আজকালের সন্তানেরা স্বাধীনতা চায়। অন্যের সাথে ঘুমাতে চায় না। কিন্তু যখন অসুখ করে, তখন মা ছাড়া চলে না।

খালাম্মা আমাদেরকে আপন মনে করেন বলেই এত উপদেশ।

সকালে খালাম্মা আমাদের জন্যে আনা উপহার বের করলেন। আমরা এটা আশা করি নাই। তিনি বকুলের জন্যে একটি সুন্দর জামদানী শাড়ি এনেছেন। আরও এনেছেন, ক্রিস্টালের দুটি ক্যান্ডল হোলডার। ক্যান্ডেল হোল্ডার টি দেখিয়ে বললেন, ক্রিস্টাল হোল্ডারে ক্যান্ডেল জ্বালালে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায়। রুমটি আরও বেশি আলোকিত হয়। খালাম্মা বললেন। আমি যখন থাকব না তখন এটা ব্যবহার করলে আমাকে তোমাদের মনে পড়বে। আমরা বললাম, খালাম্মা, আপনাকে আমরা কখনোই ভুলব না। সব সময় মনে পড়বে।

সকালে নাস্তার আয়োজন দেখে খালাম্মা বকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন। ফ্রিদা এবং তুমি যেভাবে আমার আদর যত্ন করছ, মনে হচ্ছে তোমরা আমাকে মরতে দিবে না। আমরা বললাম, খালাম্মা, একি বলছেন। আমরা তো আপনার

জন্যে সামান্য কিছু আয়োজন করেছি মাত্র।

একটি পালংকের কাহিনী

আমাদের বাসার গেস্টের রুমের পালংকের একটি কাহিনী আছে। দেখতে আহামরি কিছু না। পুরানো ফার্ণিচার বলেই মনে হয়। কিনেছি আগের বাড়িতে ওঠার সময়। যুক্তরাষ্টে প্রবাসী-হওয়ার পরে আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক সামজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ি। সে সুবাদে অনেক দেশ বরণ্য অতিথি থেকে শুরু করে আমার পুরানো বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন করতে হয়।

এ পালংকটিতে শহীদ জননী-জাহানারা ইমাম ১৯৯৩ আগের বাসায় ঘুমিয়েছেন। যদিও এবার হলোনা গেস্ট রুমটি একটু দুরে অবস্থানের জন্যে এ পালংটিতে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ১৯৮৪ থেকে আজ অবধি ঘুমিয়েছেন। বিপরীত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও এর মধ্যে আছেন।

এ পালংকে যারা ঘুমিয়ে ছিলেন, তাঁরা হলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক, কবি শামসুর রহমান, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। কবি নির্মুলেন্দু গুণ, লেখক হায়াৎ মাহমুদ, সুরঞ্জিত সেন, মোস্তফা সরওয়ার, সৈয়দ হাসান ইমাম, ড. বদরউদ্দিন ওমর, মুশতারী শফী, শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসির মামুন, মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রদূত আনয়ার উল আলম, মেজর আরেফিন, কর্ণেল সাজ্জাদ জহীর, মোনায়েম সরকার, সানজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, মিতা হক, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, ড. আব্দুল মালেক, জাস্টিজ হাবিবুর রহমান, বদিউল আলম মজুমদার, লেফটেন্যান্ট জেনারেল বাশীর প্রমুখ। এই পালংকটি জাতীয় যাদু ঘরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পৃথিবীতে আর কোনো পালংক নেই যা এত গুলো বরেণ্য ব্যক্তিকে বুকে আগলিয়েছে। দিয়েছে সুখ নিদ্রা!

জাতিসংঘে জাহানারা ইমাম

সেদিন খালাম্মাকে নিয়ে জাতিসংঘে গেলাম। জাতিসংঘে কর্মরত বাংলাদেশী লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস আগেই জাহানারা ইমামের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কমিশন এর কমিশনারের সাথে। বিকেল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট। তাড়াতাড়ি করে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে পৌছালাম। হাসান ফেরদৌস আমাদের কে স্বাগত জানালেন। ফরশত আলী আমাদের সাথে যোগ দিলেন। হাসান ফেরদৌস আমাদের তিন জনকে কমিশনারে রুমে নিয়ে গেলেন। কমিশনার একজন আফ্রিকান ভদ্রলোক। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। হাসান ফেরদৌস আগেই আমাদের পরিচয়

জানিয়েছিলেন। কমিশনার খালাম্মাকে খুব সম্মান দেখালেন। আলোচনা শুরু হলেন হাসান ফেরদৌস কক্ষ ত্যাগ করলেন।

খালাম্মার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং একটু কাশির মতো অবস্থা। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে জড়িয়ে আসে। তিনি আমাকেই আগেই বলেছিলেন, তিনি আলোচনা শুরু করবেন এবং আমি সেটাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব প্রয়োজনে। খালাম্মা শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, ধর্ষণ সর্বোপরি যুদ্ধাপরাধের কথা উল্লেখ করলেন। আমরা যে সব কাগজ পত্র, তথা উপাত্ত নিয়ে গিয়েছিলাম তা হস্তান্তর করলাম। আমি উল্লেখ করলাম, জাতিসংঘের ১৯৮১ সালের হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট এ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা হয়েছিল, যুদ্ধপরাধ হয়েছিল উল্লেখ করেছিল। অথচ যুদ্ধপরাধের বিচার আজ পর্যন্ত হয় নাই। খালাম্মা গণআদলতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের পটভূমি ব্যাখ্যা করলেন। বললেন বাংলাদেশের জনগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। আমরা এ অবস্থায় জাতিসংঘের মাধ্যমে এ যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই। কমিশনার মুখ মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনলেন। কিছু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। আমরা আমাদের কাগজ পত্রের রেফারেন্স দিয়ে সে বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরলাম।

তিনি জানালেন, জাতিসংঘ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভিযোগ আমলে নিতে পারে না। যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি আসতে হবে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে। আমরা জানালাম বাংলাদেশে ১৯৭৫ থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ক্ষমতায়। তাদের সহযোগী সংগঠন জামাতে ইসলামী সরকারের অংশ। তাই বর্তমান সরকার যুদ্ধা পরাধীদের বিচার চাইবে না। কমিশনার আমাদের দাবির প্রতি সমবেদনা থাকা সত্ত্বেও তার কমিশনের পক্ষ থেকে কিছুই করতে পারবে না। তবে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গঠন হলে সব যুদ্ধাপরাধের বিচার তরান্বিত হবে। তিনি আমাদের তথ্য উপাত্তের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। আমরাও কমিশনারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এই মিটিং এ আমাদের আশা ছিল খুব কম তাই আমরা নিরাশ হলাম না। খালাম্মা বললেন, আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। একদিনে সাফল্য অর্জন হবে না।

ফরাশত আলীর রেস্টুরেন্টে হালকা চা নাস্তা খেয়ে বাসায় ফিরলাম।

খালাম্মার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তাই করেই এবার অন্য কোনো কর্মসূচি রাখি নাই। গত রাতেই বকুলের কাছে শুনেছি খালাম্মার উপর দেওয়া রেডিয়েশন থেরাপির সাইড অ্যাফেক্ট। তিনি বকুলকে দেখিয়েছেন, রেডিয়েশন থেরাপির জন্যে উনার বুকের চামড়া পুরো কালো হয়েছে। সবসময় ব্যথা অনুভব করেন।

খালাম্মাকে আগেই জানিয়েছেন, সেবারের বেঙ্গল স্টাডিস্ কনফারেন্স বাংলাদেশের গণ আদালতে যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিষয়ের উপর কোনো পেপার

দেওয়া যাবে কিনা। আমাকে আয়োজকরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল একটি প্রবন্ধ জমা দেওয়ার জন্যে। কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজে। আমি উনাকে অনুরোধ করেছিলাম উনি কনফারেন্স উপস্থিত থাকবেন কিনা। তাহলে আমি এবং উনি মিলে প্রবন্ধটি পড়তে পারি। উনি ঢাকা থেকে কোনো মতামত দেন নাই, কিন্তু সংঙ্গে একটি প্রবন্ধ এনেছেন। আমাকে দিয়ে বললেন, দেখ এটা দিয়ে চলবে কিনা। দরকার হলে সম্পাদনা করে নিও।

আমি প্রবন্ধটি পড়ে দেখলাম। খুব ভালো প্রবন্ধ। কিন্তু গবেষণা প্রবন্ধ হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স জমা দেওয়ার জন্যে যে রীতি নীতি আছে তা অনুসরণ কর হয় নাই। আমি খালাম্মাকে বললাম এটাতে আরও কিছু যোগ দিয়ে রীতিনীতি অনুসরণ করে জমা দিলে এটা গ্রহণ হবে আমি মনে করি। তিনি বললেন, তাই করো। খালাম্মা চলে যাওয়ার পর প্রবন্ধটি নূতনভাবে লিখে আরও তথ্য উপাত্ত যোগ দিয়ে খালাম্মা ও আমার নামে জমা দিয়েছিলাম। প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলাম People's movement in Bangladesh for the Trial of Bangladesh War Criminals of 1971, Nuran Nabi and Jahanara Imam. দুঃখের বিষয়, জাহানারা ইমাম কনফারেন্স এর আগেই ইহজগত ত্যাগ করেন। তবে প্রবন্ধটি গৃহীত হয়েছিল, আমি একাই এটি সম্মেলনে পড়েছিলাম।

ওয়াশিংটন ডিসিতে জাহানারা ইমাম

এর পরের দিন ২১ জানুয়ারি খালাম্মা ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবেন। ওখান সে দিন বিকেলে একটি জনসভার আয়োজন করেছে স্থানীয় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। আমাদের যাওয়ার কথা ছিল। ভেবেছিলাম খালাম্মা আমাদের সাথে গাড়িতে যাবেন। কিন্তু অত দূর গাড়িতে যেতে ওনার কষ্ট হবে, তাই ওনাকে প্লেনে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গে বকুল থাকলে ভালো হত বলে তিনি মন্তব্য করলেন। একা যেতে হবে জেনে একটু মনখারাপ করলেন। আগে এটা জানলে হয়তো আমারা তিন জনে একসঙ্গে প্লেনে ওয়াশিংটন ডিসিতে যেতাম। এটা না ভাবার কারণ হলো আমার বাসা থেকে ডিসিতে প্রায় তিন ঘন্টা লাগে গাড়িতে। আর প্লেনে ডোর টু ডোর একই সময় লাগে। খালাম্মার গাড়িতে কষ্ট হবে আগে জানলে আমরাও প্লেনে যেতাম।

আমি ও বকুল খালাম্মাকে এয়ারপোর্টে উঠিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটন রওনা হলাম। খালাম্মা এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে আমাদেরকে ওয়াশিংটন ডিসির উল্টো দিকে যেতে হয়েছিল। তার ফলে এখন আমাদের এক ঘন্টা বেশি সময় লাগবে। অর্থাৎ এখন তিন ঘন্টার পরিবর্তে চার ঘণ্টা লাগবে। হাতে প্রচুর সময় আছে। আমরা জনসভায় ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব। ডিসির দিকে বরফ পড়েছিল একটু

একটু। তাই সময় একটু বেশি লাগলো।

ডিসিতে সমন্বয় কমিটির ড. খোরশেদ আলম চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম। হারুন চৌধুরী এ অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্ব ছিলেন। অনুষ্ঠানটি একটি চার্চে আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান স্থলে পৌছে দেখি লোকজন এসে গেছেন। জাহানারা ইমাম তখনো পৌঁছেন নাই, তিনি রাস্তায়। উনি আসতেই অনুষ্ঠান শুরু হল। তিনি আগেই বলেছিলেন, আমার গলার অবস্থা খুব খারাপ। তুমি তোমার বক্তৃতায় এই বিষয়ে বলবে। পাছে যদি আমি কাশীর জন্যে বলতে না পারি।

বকুল খালাম্মার জন্যে পানি ইউর্গুট ও আরও কিছু খাবার সঙ্গে এনেছে। খালাম্মা জেনে খুশি হলেন। একটু পানি ও ইউর্গুট খেয়ে বসলেন। আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম অনু, ড.খোরশেদ আলম চৌধুরী, ইকবাল বাহার চৌধুরী, হারুন চৌধুরী, ওয়াহিদ হোসাইন প্রমুখ বক্তব্য রাখলেন। সবাই জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে প্রশংসা করলেন এবং চলমান যুদ্ধারাধীদের বিচারের দাবী সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেন। আমি খালাম্মার নির্দেশ অনুযায়ী তার দেওয়া বিশেষ বিশেষ বিষয় গুলি উল্লেখ করে বক্তব্য রাখলাম। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করলাম প্রবাসে মূলধারার সাথে বাংলাদেশের যুদ্ধপরাধের এ বিচারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সিনেট ও কংগ্রেসে লবি করা।

প্রধান অতিথি হিসাবে জাহানারা ইমামের বক্তৃতার পালা। তিনি খুব আস্তে আস্তে নিচু স্বরে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। ওনার পাশেই আমি বসেছি। এত কাছে থেকেও আমি বুঝতে পারছিলাম না উনার কথা। ভাবলাম উনি কিছু না বললেই হয়তো ভালো হতো। আমার ধারণা-ভুল প্রমাণ করলেন। আস্তে আস্তে উনার কথা সুস্পষ্ট হতে থাকল। কণ্ঠস্বর উচুতে উঠল। তিনি তার স্বভাব সুলভ বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করলেন। উনার যে কষ্ট হচ্ছে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমাকে যে বিষয়ে বলতে বলেছিলেন, সেগুলো তিনি আবার উল্লেখ করলেন। শেষে বললেন, আমি হয়তো বেশি দিন বাঁচব না, আমি আমার কথা রেখেছি। এবার আপনাদের পালা। আপনারা প্রবাসে ও দেশে এ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আমি এই অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন।

বকুল উনার জন্যে পানি ও ইউর্গুট নিয়ে মঞ্চের পিছনে উপস্থিত ছিল। খালাম্মা খেতে শুরু করলেন। কিন্তু থামতে হল, ভক্তদের ছবি তোলার প্রতিযোগিতার জন্যে। খাবারের সময় ছবি তোলা তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। সভাশেষে খালাম্মাকে পরের দিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে উনার সাক্ষাতের কথা নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি অফিসে বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি বিধায় ছুটি নিতে

পারি নাই। তাই ওনার সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মিটিং এ থাকতেও পারব না জানালাম। তিনি খুব নিরাশ হলেন। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের সাউথ ইস্ট এশিয়া বিভাগের বাংলাদেশ ডেসক্ এর পরিচালকের সাথে উনার মিটিং। উনি আমাকে মিটিং এর টকিং পয়েন্ট তৈরি করতে বলেছিলেন। আমি সেটা উনার হাতে দিলাম। দেখে বললেন, ঠিক আছে। তুমি সাথে থাকলে ভালো হতো। সে রাতে আমাদেরকে নিউ জার্সি ফিরতে হবে। মৃদুমৃদু বরফ পরছিল। গাড়ি চালাতে বিপদের সম্ভাবনা তো আছেই, এ ছাড়া রাতে আস্তে আস্তে চালাতে হবে। ঘরে ফিরতে হয়তো মধ্যরাত্র হবে। তাই উনার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

জাহানারা ইমাম ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় ভক্তদের সাথে কয়েকদিন কাটিয়ে ২৭ জানুয়ারি ডোট্রোয়েট ফিরেছিলেন।

উনার সাথে টেলিফোনে জেনেছিলাম পররাষ্ট দফতরে সাক্ষাৎটি ভালো হয়েছিল। তিনি খুব জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন। কেন যুদ্ধপরাধের বিচার হতে হবে। কেন যুক্তরাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে হবে। তিনি গোলাম আযম ও অন্যান্য যুদ্ধপরাধীদের উপর দলিলপত্র সাক্ষাতের সময় ডিরেক্টরের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। গত চারদিনে জাহানারা ইমামকে খুব কাছে থেকে দেখলাম। সেবা করার সুযোগ পেরেছিলাম। একটি জিনিস লক্ষ করেছিলাম, তিনি খুবই অসুস্থ। আত্মপ্রত্যয় আগের মতোই আছে কিন্তু ভগ্ন শরীর। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তবু ও তিনি বলতে চেষ্টা করছেন আন্দোলনের কথা বলতে। চেষ্টা করছেন তার কথা সবাইকে জানাতে। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সে রকম।

তিনি ঢাকাতে আন্দোলনের গতি নিয়ে ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ১৯৯৩ এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে প্রকাশ করবেন। কাজের কোনো অগ্রগতি হয় নাই। সে তারিখ পার হয়েছে বলে তিনি খুব নিরাশ হয়েছেন। পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬ মার্চ ১৯৯৪। তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন, সে তারিখ ও কি পার হয়ে যাবে। তিনি জনগণের কাছে কিভাবে মুখ দেখাবেন। আমার বাসা থেকেই কয়েকবার কয়েকজনকে ফোন করেছিলেন গণতদন্ত কমিশনের কাজ তরান্বিত করার জন্যে।

একদিন বললেন, নবী, মনের দুঃখের কথা কাকে বলব। আমি না থাকলে কাজ আগায় না। যারা কাজের দায়িত্ব নিয়ে পিছিয়ে যায়, কথা রাখে না তাদের কে নিয়ে কি ভাবে কাজ করব। কিভাবে কাজ আগাবে। তিনি জানালেন, গণ আদালতের সময় যারা সক্রিয় ছিল, তাদের অনেকে এখন আর সক্রিয় নয়। অনেকে সরকারের রোষানল থেকে বাচার জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়েছেন। তরুণ কর্মীদের মধ্যে অনেকে পরিবারের চাপে কাজ করছে না। পাছে তাদের ক্যারিয়ার নষ্ট হয়। ও সব হতাশা তিনি আমার সাথে ভাগ করলেন।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি বাইরে সবসময় আশাবাদ ব্যক্ত করতেন। বিশ্বাস করতেন জয়যুক্ত হবেনই। আমি উনাকে নিয়ে ভাবলাম। উনি একজন শিশুর মত পবিত্র মনের মানুষ। সাদা মনের মানুষ। প্রগতিশীল আদর্শের একজন আধুনিক মহিলা। সুখে শান্তিতে স্বামী দু'ছেলে নিয়ে তার জীবন চলছিল। শিক্ষা সাহিত্য নিয়ে ছিল তাঁর জগত। হঠাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ তার এ সুখের জীবনকে ঝড়ের মত উলট পালট করে দেয়। ছেলে স্বামী হারানোর বেদনা সামাল দেওয়ার আগেই মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন।

এই মহিলাকে আমরা টেনে নামিয়েছি রাজনৈতিক আন্দোলনে। রাজনীতির বড় কঠিন খেলা। ক্ষমতায় যাওয়ার খেলা। নিজস্বার্থ রক্ষার খেলা। রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র। এখানে আপোস হয় প্রতিনিয়ত। দিনের বেলায় গালি-গালাজ, রাতে বেলায় বন্ধু, এক টেবিলে ডিনার। এদের মাঝে জাহানারা ইমাম এক ভিন্ন জগতের মানুষ। অনেকটা এলিয়েন, অন্য গ্রহের বাসিন্দা।

জাহানারা ইমাম ওদের তুলনায় স্বার্থহীন মানুষ। এক কথার মানুষ। আদর্শের মানুষ। কথা দিয়ে কথা রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কথা দিয়ে তা ভাঙ্গতে শিখেন নাই। যা বলেন, তা করেন। এটাই তার জীবনের আদর্শ। তবু ও এদেরকে নিয়ে আন্দোলন করেছেন। সাফল্য অর্জন করেছেন। যখন তাদের আসল পরিচয় পান, দেখেন আর একটি ভিন্ন-মুখ, তিনি নিরাশ হন। অথচ তাদের কাছে তাদের স্থান পরিবর্তন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যা জাহানারা ইমাম জানতেন না। জাহানারা ইমাম তাদের ব্যবহারে হতাশ, ব্যথিত। তবুও আশা ছারেনি। এদের নিয়ে আন্দোলনে আগাতে হবে। কোনো অন্য পথ জানা নেই। কিন্তু জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে হয়তো এত হতাশা সামাল দিতে পারে না।

তবুও তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি সামনে আগাতে পারেন। সবাইকে নিয়ে।

তিনি জানালেন, শরীর ভাল না, তবু তিনি যে কোন কিছুর বিনিময়ে ২৬ মার্চ গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ করবেন। দরকার হলে নূতন কর্মীদেরকে দায়িত্ব দিবেন। আমি উৎসাহ দিলাম। বললাম, খালাম্মা কিছু কিছু নেতা কর্মীর কাজে আপনি হতাশ হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ আপনার সাথে রয়েছে। হাজার হাজার কর্মী এগিয়ে এসে অলস ও দায়িত্বহীনদের জায়গা পূরণ করবে। আপনি এগিয়ে যান।

তিনি বললেন, আশা করি তোমার কথাই ঠিক হবে। আমি মিশিগানে গিয়ে এ কাজ মনোযোগ দিব। দরকার হলে দেশে ফিরে যাব। গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ২৬ মার্চের আগেই প্রকাশ করব সৃষ্টিকর্তার আর্শীবাদে।

তিনি মিশিগানে ফিরে গিয়ে তাই করেছিলেন।

মিশিগানে মৃত্যুসজ্জায়

শুরুতেই উল্লেখ করেছি, ২ এপ্রিল ৯২ সকালের দিকে জাহানারা ইমাম মিশিগানে তার পুত্র জামীর বাসা থেকে ফোন করেন। খুব ক্লান্ত থাকার জন্যে এতটুক কথা বলেই বিকেলে ফোন করতে বলেছিলেন। আমি বিকেলে জাহানারা ইমামকে ফোন করলাম। তিনি সাথে সাথেই ফোন উঠালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালাম্মা এতক্ষণ কেমন আছেন? একটু কি বিশ্রাম হয়েছে? এখন কথা বলতে পারবেন? তিনি জানালেন, 'না, কথা বলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। একটু ঘুমিয়েছি, বেশ ভাল লাগছে। আবার সকালের সেই প্রশ্ন। তোমরা কেমন আছো। ছেলেরা কেমন আছে। তিনি আমার পরিবারের সবাইকে চিনেন। অনেক বার দেখা হয়েছে। দুবার আমাদের বাসায় থেকেছেন।

আমরা সবাই ভাল আছি জানালাম। উনি সকালে ফোনে জানিয়েছিলেন, তিনি জরুরি রাজনৈতিক বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করবেন। আমি সে বিষয়ে না গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খালাম্মা, আপনার স্বাস্থ্যের খবর কি? হঠাৎ করে ফিরে এলেন, কোন নূতন সমস্যা দেখা দেয় নি তো?

তিনি বললেন, ঢাকাতে খুব খারাপ সময় কেটেছে। শরীর এবং মনের উপর অনেক ধকল গিয়েছে। নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সে সব সামলাতে শরীর খারাপ হয়েছে। মিশিগানে ডাক্তারদের সাথে ফোনে পরামর্শ করলাম। ডাক্তার কালবিলম্ব না করে চলে আসতে বলল। তাই তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম তোমাকে অতীতের মত কল করতে পারি নাই। খালাম্মা যখন এসব কথা বলছিলেন, আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ওনার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ। মাঝে মাঝে কাঁপছেন।

তেরটি বছর তিনি ক্যান্সার নামক দৈত্যের সাথে লড়াই করেছেন। এই দৈত্যটিকে তিনি কলসের ভিতরে বন্দি করে রাখতে পেরেছিলেন। অপারেশন, রেডিয়েশন থেরাপি কেমো থেরাপির এর মত কঠিণ চিকিৎসা, কঠোর শৃঙ্খলার মাধ্যমে জীবন জাপন মোটামুটি দেত্যটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। কিন্তু ৯২ এর ১৯

তারিখের পর আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে সে কঠোর শৃঙ্খলায় ভাটা পড়েছিল। শারীরিক এবং মানসিক চাপের মুখে জীবন কাটাতে হয়েছে। এভাবে ক্যান্সার নামক দেত্যটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এবার ক্যান্সার খালাম্মাকে গ্রাস করতে চাইছে।

জাহানারা ইমাম দেখতে সুন্দরী মহিলা বলে খ্যাতি ছিল। ওনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উনাকে সুচিত্রা সেনের সাথে তুলনা করত। তিনি নিজেও বেশ ভূষায় খুব সৌখিন ছিলেন। প্রথম অপারেশনে তার চোয়ালের একটি হাড় কেটে ফেলতে হয়েছিল। তার উপর কয়েকটি দাঁত ফেলে দিতে হয়েছিল। থুতনির নীচে অপারেশনের ফলে মুখের চামড়া একটু কুঁচকে গিয়েছে। এসব নিয়ে উনার মুখমণ্ডলের পরিবর্তন হয়েছিল। আগের চেহারার সাথে অনেক গরমিল। এত মনের জোড় এবং আত্মপ্রত্যয়ে তিনি সেই মানসিক যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কিছুটা লক্ষ করেছি তিনি ছবি তোলার সময় সচেতন থেকে চেহারা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করতেন। অনুমতি ছাড়া হঠাৎ করে কেউ ছবি তুললে তিনি তো মোটেই পছন্দ করতেন না।

আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক বা চলমান আন্দোলনের দিকে নিতে চাইছিলাম না। তাই উনার শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই বললেন চিকিৎসার কথা আগামী কাল আলোচনা করব। আজ তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই মনোযোগ দিয়ে শোনো।

তিনি বললেন। তোমাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব। সেটা তোমাকে রাখতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম, খালাম্মা সেটা কি? আমি আপনার অনুরোধ রাখব না তা কি করে হয়? আমার সাধ্য থাকলে অবশ্যই রাখব। তিনি বললেন আমার শরীরের যে অবস্থা, মনে হচ্ছে, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এ যাত্রায় বোধ হয় আর রক্ষা হবে না।

আমি বললাম, খালাম্মা, ওসব দুঃশ্চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলুন। আপনার চিকিৎসা শেষে ভালো হয়ে আবার দেশে ফিরতে হবে। দেশবাসী আপনার পানে চেয়ে আছে। আপনাকে ছাড়া আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলবে।

তিনি বললেন, সুস্থ হলে অবশ্য দেশে ফিরব। কিন্তু যদি মরে যাই, তবে আমার মরদেহে বাংলাদেশে পাঠাবে না। তোমাকে একাজটি করতে হবে। আমি তো শুনে অবাক। খালাম্মা এ কথা কেন বলছেন? আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি একটু দম নিয়ে মাথা ঠিক রেখে ধীরস্থির ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, খালাম্মা কেন আপনি এ কথা বলছেন? তিনি যখন উনার স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছিলেন ক্ষীণ কণ্ঠে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। কিন্তু এবার তার কণ্ঠস্বর একটু জোরালো, মনে হচ্ছিল উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমরা আপনার মরদেহ বাংলাদেশে

পাঠাতে পারব না? যদিও জন্ম মৃত্যু সৃষ্টকর্তার হাতে। কেন আপনার মরদেহ বাংলার মাটির বুকে মিশে যেতে মানা করছেন?

তিনি এবার স্পষ্ট করে বললেন, এবার আমি ঢাকা ত্যাগ করেছি মনে অনেক কষ্ট নিয়ে। অনেক দুঃখ নিয়ে। যাদের নিয়ে এতদিন আন্দোলন করলাম, যাদেরকে জনগণ তাদের নেতা মানে, আদর্শিক এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব মনে করে তাদের আসল চেহারা আমি দেখে এসেছি। এরা আমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। বেইমানী করেছে, জনগণকে ধোকা দিয়েছে। আমার মরদেহ তোমরা ঢাকা পাঠাবে। আর এই সব দুমুখো নেতারা বিমান বন্দরে, জানাযায় আমার লাশ বহন করবে আর কাঁদবে। দেখাবে যে তারা আমাকে কত ভালোবাসে। টেলিভিশনে ও পত্রিকাতে ছবি উঠবে। আর বাহবা কুড়াবে। এদের এ দ্বৈতনীতি আমার আত্মাকে পীড়া দিবে। তুমি আমাকে কথা দাও, আমার মরদেহ যেভাবেই পার এখানে করব দিবে।

খালাম্মার কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। কিন্তু এখন এটা নিয়ে খালাম্মার সাথে তর্ক করা ঠিক হবে না। আমি শুধু বল্লাম, খালাম্মা, আপনার কথার অবাধ্য আমি কোনো দিনই হব না। এ সবের কোনো প্রয়োজন হবে না এখনি। আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আপনি বিশ্রাম নেন। আগামীকাল আবার কথা বলব। দেখেন ডাক্তার কি বলে। এই বলে ফোন রাখলাম।

জামীকে ফোন করলাম। বুঝতে চাইলাম জামীকে খালাম্মা কি কিছু বলেছে? তার মরদেহ দেশে না পাঠাতে। আমার ধারণা ঠিক। খালাম্মা জামীর সাথে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেন নাই। হাজার হোক ছেলে তো। তাকে হয়তো মৃত্যুর কথা ওভাবে বলতে পারেন নাই। জামী জানালো খালাম্মার শরীরে অবস্থা খুবই খারাপ। কি যে হবে একমাত্র আল্লাহই জানেন। জামি জানাল, তার স্ত্রী ফ্রিদা ও সে খুবই চিন্তিত। এ যাত্রায় কি হবে বুঝতে পারছি না। আগামীকাল মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। রাজনৈতিক আলোচনায় আমি খালাম্মাকে আরও সময় দিয়ে বিলম্বিত করতে চাইলাম। সময় দীর্ঘায়িত হলে খালাম্মা হয়তো রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ করতে সহজে উত্তেজিত হবেন না।

তাই আমি একদিন পরে আবার ফোন করলাম। প্রথম স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ডাক্তার কি বলেছে জানতে চাইলাম। ডাক্তারের কাছে আবারও যেতে হবে। অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে হবে। তারপর বলতে পারবে কি চিকিৎসা করতে হবে।

আমি রাজনৈতিক আলাপ এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। উনাকে রাগান্বিত বা উত্তেজিত না করতে চেয়েছি। গত দু দিন ফোন করি নি। কিন্তু জামীকে প্রতিদিন কল করে খালাম্মার খোজ খবর রাখতাম।

কয়েকদিন পর জাহানারা ইমাম নিজেই ফোন করলেন। জানালেন হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। অপারেশন করতে হবে। হাসপাতালে কি হবে, জানি না। তাই তোমাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা বলে যেতে চাই। তিনি উনার মরদেহ কেন বাংলাদেশে পাঠাতে মানা করছেন, তার সার সংক্ষেপে এইভাবে বলেছিলেন।

জাহানারা ইমাম ২৬ শে মার্চ ৯৩ গণতদন্ত কমিশন গঠন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে গোলাম আযম ছাড়াও আরও অনেকে যুদ্ধাপরাধ করেছিল যাদের অনেকে রাজনীতিতে পুর্নবহাল হয়েছে জিয়াউর রহমান, এরশাদের ও খালেদা জিয়ার আমলের ছত্র ছায়ায়। গোলাম আযমের গণআদালত বিচার সাফল্য মণ্ডিত হওয়ায় জাহানারা ইমামের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের জনগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। তাই তিনি আরও ৮ জন যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য গণতদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন।

যুদ্ধপরাধীদের তালিকায় ছিল (১) আব্বাস আলী খান (২) মতিউর রহমান নিজামী (৩) মো. কামরুজ্জামান (৪) আব্দুল আলী (৫) দেলোয়ার হোসেন সাইদী (৬) মওলানা আব্দুল মান্নান (৭) আনোয়ার জাহিদ ও (৮) আব্দুল কাদের মোল্লা।

গণতদন্ত কমিশনের সদস্য নির্বাচিত জন ১১ জন বিশিষ্ট নাগরিক যারা ৯২ গণআদালতের বিচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল (চেয়ারপার্সন) সাহিত্যিক শওকত ওসমান, শিক্ষাবিদ ড. খান সরোয়ান মুরশিদ, বিচারপতি (অবঃ) দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিচারপতি (অবঃ) কে, এম সোবহান, কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক ডঃ অনুপম সেন, অধ্যাপক এম, এ লায়েক, সাংসদ সালাউদ্দীন ইউসুফ, এয়ারভাইস মার্শাল (অবঃ) সদররুদ্দিন ও ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (সমন্বয়কারী)।

জাহানারা ইমাম সবার সাথে পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন যে ৯৩ এর ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ের এই আটজন যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে কমিশন তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করবে।

জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্যের অবনতি হলো। উনাকে হঠাৎ করে আমেরিকা আসতে হলো অক্টোবর মাসে। ঢাকাতে তদন্ত কমিশনের কাজে ভাটা পড়ল। তিনি আমেরিকা থেকে জানতে পারলেন ১৬ই ডিসেম্বর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তার টেলিফোনে তদারকি করেও কোনো কাজ হচ্ছিল না। আমাকেও যোগ দিতে বললেন, কেন কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি ঘোষণা দিয়েছি। সে কথা রাখতে না পারলে জনগণের বিশ্বাস আমরা হারাব। আমি ঢাকায় ফোন করে জানতে পারলাম, তদন্ত কমিশন গঠন করার সময়ে তারা শর্ত দিয়েছিলেন তদন্ত কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। সমন্বয় কমিটি কোনো তদারক করতে পারবে না। তাছাড়াও তদন্ত কমিশনের সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তি।

তাদেরকে তাড়া দেওয়ার ধৃষ্টতা আমি দেখাতে পারব না। তবে যদি অর্থাভাবে কাজের সমস্যা হয়ে থাকে সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কমিটি সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। জানতে পারলাম তদন্ত কমিশনের সমস্যা অনেক জটিল।

আমি খাল্লামাকে আমার মতামত জানালাম। তিনি বললেন তার ও বিশ্লেষণ আমার মতো। উনাকে ঢাকা না গেলে এর সমস্যা সমাধান হবে না। তিনি জনগণের কাছে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতির দাম তার নিজের স্বাস্থ্যের চেয়েও মূল্যবান মনে করলেন। ডাক্তাদের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা চলে গেলেন। কি দায়িত্ববোধ ! নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করেই ছুটে গেলেন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট যথাসময়ে বের করতে।

ঢাকা এসে অনেক কলকাটি নাড়িয়ে তদন্ত কমিশনের যে কাজ এক বছরে সমাপ্ত হয় নি, তা এক মাসে সমাপ্ত করলেন। কি সাংগঠনিক দক্ষতা। কি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব !

৯৪ এর ২৬ মে মার্চ ঢাকায় এক বিশাল জনসভায় তিনি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। অভিযুক্ত আটজনই তদন্তে যুদ্ধাপরাধী অভিযুক্ত হলেন। এই ঐতিহাসিক বিশাল সমাবেশে তিনি সভাপতিত্ব করলেন। এই সভায় জাহানারা ইমাম দ্বিতীয় পর্যাযে আরও আটজন যুদ্ধাপরাধীদের নাম ঘোষণা করলেন।

সমস্যা দেখা দিল দ্বিতীয় পর্যায়ের আট জনের নাম নিয়ে। ২৬ শে মার্চের আগে প্রথম তদন্ত কমিশনের রিপোট যখন তৈরি হচ্ছিল। তখন জাহানারা ইমাম দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধপরাধীদের নামের তালিকা তৈয়ারীর প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন। এ বিষয়ে অনেকেই আপত্তি করছিলেন নূতন তালিকা তৈয়ারী না করতে। এতে শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের যে মোট ১৬ জন যুদ্ধপরাধীরা সবাই বিত্তবান। ক্ষমতাশীল দলের মন্ত্রী বা এমপি। বিরোধীদের যুক্তি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম প্রকাশ করলে সমন্বয় কমিটি পুরো বিষয়টি সামাল দিতে পারবে না।

অন্যদিকে জাহানারা বিশ্বাস করতেন জনগণ সব যুদ্ধপরাধীদের বিচার চায়। কমিটির কিছু কিছু সদস্য দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকা আট জনের বেশি যুদ্ধাপরাধীকে অর্ন্তভূক্তি করতে। এ দু বিপরীত স্রোতের মধ্যে বড় রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী এবং একব্যক্তিত্ব এর সাথে এক সঙ্গে অনেক সময় পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠক করেছেন। উভয় পক্ষের যুক্তি পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় পর্যায়ের আট জনের তালিকা ঘোষণা করলেন। সবাই মেনে নিল। তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের আট জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিলেন।

জাহানারা ইমামকে অবাক ও হতাশ করে দিয়ে কিছু কিছু নেতা উনাকে অনুরোধ জানালেন দ্বিতীয় পর্যায়ের আট জনের তালিকা থেকে সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী সহ আরও দুএকজনকে বাদ দেওয়ার জন্যে। বিশেষ করে প্রথমে অনুরোধ

এবং শেষ দিকে প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। এ বিষয়ে একটি মিটিং এ জাহানারা ইমামকে অপমান করা হলো।

জাহানারা ইমাম যখন সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর নাম বাদ দেওয়ার কথা বলছিলেন, তখন আবারও উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। বিশেষ করে যারা নাম বাদ দেওয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করতেই তিনি উত্তেজিত হচ্ছিলেন।

আমি খালাম্মাকে অনুরোধ করছিলাম। আজ থাক আর একদিন শুনব। তিনি বললেন আর একদিন হয়তো কখনো আসবে না। যদিও কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও আজ এ বিষয়ে শেষ করতে চাই এই জন্যে যে তুমি বুঝবে কেন আমার মরদেহ বাংলাদেশে পৌছাতে মানা করছি।

আমার মনের কষ্ট তোমাকে বোঝাতে পারব না। যাদের সাথে এক সঙ্গে আন্দোলন করলাম, যাদের সাথে একাত্ম হয়ে গোলাম আযমের, গণ আদালতে বিচার করলাম, তাদের কেন এ পরিবর্তন হল যে সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে এত চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য। আমি ক্লান্ত, আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। খেতে গলায় যন্ত্রনা । আমার মনে প্রশ্ন কি যাদু আছে সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর হাতে? কি তার ক্ষমতা যে আমাদের লোকেরা আমার কাছে আসছে তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে। তিনি আরও বললেন, ঘৃণায় রাগে আমার বমি আসতে চাচ্ছিল। অনেকেই ফোন করছিল, এমনকি মধ্যরাত্রিতে বাসায় হানা দিচ্ছিল সালাউদ্দীন কাদেরের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে।

সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর যুদ্ধাপরাধের কথা সর্বজন স্বীকৃত। কেন তাকে তালিকা মুক্ত করার জন্যে এত প্রচেষ্টা? এক নাগাড়ে খালাম্মা কথা বলে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে আমি বলার চেষ্টা করছিলাম। খালাম্মা আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি একটু শান্ত হন। তিনি বলছিলেন, নবী-না, তুমি বুঝতে পারবে না। এরা আমার সাথে বেইমানী করেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এদের মুখ আমি আর দেখতে চাই না। তাই আমার মরদেহ ঢাকায় পাঠাবে না। আমার লাশ নিয়ে মাতামাতি করবে হিরো হবে সেটা আমি চাই না। তুমি কথা দাও। জামীকে নিয়ে আমার লাশ এখানে কবর দিবে।

আমি বললাম। খালাম্মা আপনি চিন্তা করবেন না। বিশ্রাম নেন। চিকিৎসার দিকে মনোযোগ দেন। রাজনীতির কথা আবার আলোচনা করা যাবে। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। মনে হলো আমার সান্তনা কোন কাজে লাগল না।

আমি ওয়াদা করলাম। জামীর সাথে পরামর্শ করব। আপনার মতের বাইরে আমরা কিছুই করব না। তিনি ফোন রেখে দিলেন।

জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্যের অবনতি প্রতিদিন আশংঙ্কাজন মনে হচ্ছে। তাঁর

গলার ব্যথা বাড়ছে। খেতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু তরল খাদ্য খেতে পারছেন। পরীক্ষা চলছে। ক্যাট স্ক্যানে গলা এবং বুকের উপর সন্দেহ জনক দাগ ধরা পড়েছে। কিন্তু সেটা কি তা ডাক্তার কিছু বলতে পারছে না। তাই বাইওপসি করতে হবে হাসপাতালে। বাইওপসি যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা। সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে গলার ভিতরে যন্ত্র ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। এপ্রিল ১২ তারিখে জাহানারা ইমামকে তাঁর চিকিৎসক টিম পরীক্ষা করলেন। তাঁর বুকে এবং গলায় যে দাগ ধরা পড়েছে ক্যাট স্ক্যানে, তা ইনফেকশন না টিউমার, তা ডাক্তারগণ বলতে পারলেন না।

জামীর সাথে প্রায় প্রতিদিন কথা হতো। ভাবলাম খালাম্মার হাসপাতালে ভর্তির আগে কথা বলা প্রয়োজন। ফোনে বললাম, খালাম্মা আপনি হাসপাতালে শীঘ্রই ভর্তি হচ্ছেন। আপনি ভালো হয়ে উঠবেন আমরা সবাই এ প্রার্থনা করছি। আল্লাহ না করুক, যদি আপনার কিছু হয়, আমি মনে করি আপনার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো উচিৎ। আপনি সমস্ত দেশবাসীর বিশেষ করে নূতন প্রজন্মের প্রেরণার উৎস। আপনি না থাকলেও আপনার স্মৃতি দেশবাসীকে শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে নয়, অন্য যে কোনো সংগ্রামে প্রেরণা যোগাবে। আপনি দয়া করে অনুমতি দিন। কথা শুনছিলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। আমি একটু আশান্বিত হলাম। এ বিষয়ে খালাম্মার মনোভাব হয়তো একটু নরম হয়েছে। অথবা হয়তো শারীরিক অবস্থা নিয়ে খুবই আড়ষ্ট। অন্য কোনো বিষয়ে আপাতত ভাবার কোনো সময় নেই। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। স্থির করলাম, যে করেই হোক উনার অনুমতি নিতেই হবে। এ রকম একজন আদর্শ নেতার মরদেহ বিদেশে কবর দেওয়া যাবে না। যে মাটিকে মুক্ত করার জন্যে তার ছেলে এবং স্বামী জীবন দিয়েছে। সে মাটিতে তার কবর হতেই হবে।

এ বিষয়টি নিয়ে আমি একমাত্র জামীর সাথে কথা বলব বলে স্থির করলাম। কিন্তু সেটার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকলাম। ভাবলাম প্রয়োজনে আমি বিমানে মিশিগান যাব এবং এ বিষয়ে খালাম্মা ও জামীর সাথে কথা বলব। কিন্তু অপরাশনের ফল কি হবে কে জানে।

হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে আবার একদিন ফোন করলাম। তিনি আফসোস করে বললেন গত বছর যদি ১৬ ডিসেম্বরে গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হতো তাহলে উনাকে চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে হঠাৎ করে বাংলাদেশে যেতে হতো না। এখানে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকলে হয়তো স্বাস্থ্য এভাবে খারাপ হতো না। তিনি বললেন, যাক, এসব ভেবে এখন আর লাভ নেই। আমার কপালে যা আছে, তাই হবে। এটা ভাগ্য। ছেলে হারালাম, স্বামী-হারালাম। ভাবলাম আমার এ দুঃখ নিয়ে বাঁচতে হবে। তারপর এল মরণব্যাধি ক্যান্সার। সেটা কেন হলো? সেটাও মেনে নিয়ে ক্যান্সারের সাথে বসবাস করছিলাম। সে অবস্থায় দেশের জন্যে ডাক এল। সাধ্যমতো আন্দোলন করলাম। কিন্তু এখন এ কেমন পরীক্ষা? কথা

বলতে খেতে কষ্ট হচ্ছে। আমি কি ভাবে বাঁচব।

খালাম্মাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। ফোনের অপর প্রান্তে মিশিগানে তিনি। এ প্রান্তে নিউ জার্সিতে আমি। কেঁদে চোখ ভাসাচ্ছি। বুকে একরাশ ভারী যন্ত্রণা। ফোন রাখার আগে বললাম, খালাম্মা, আপনি সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখেন। দেশবাসীর দোওয়া রয়েছে আপনার উপর। আপনি ভালো হয়ে উঠবেন। তিনি বললেন। তাই যেন হয়। তোমরা আমার জন্যে দোওয়া করবে। আমি বললাম। খালাম্মা, আপনার অপারেশনের পর মিশিগানে আসব আপনাকে দেখতে। খোদা হাফেজ!

জামী জানালো ২১ তারিখে খালাম্মার অপারেশন হয়েছে। উনাকে নিবিড় পর্যাবেক্ষণে থাকতে হবে হাসপাতালে। বেশ কিছুদিন পর জিজ্ঞেস করলাম। আমি খালাম্মাকে কবে দেখতে আসতে পারি? জামী বলল, নবী-ভাই একটু হয়তো অপেক্ষা করতে হবে। কয়েকটা দিন যাক, আমি আপনাকে জানাব।

কয়েক দিন পর আবার জামীকে ফোন করলাম। এবার জামি সব খুলে বলল। অপারেশন করে গলা খুলতেই ডাক্তার দেখতে পায় ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু করার নেই। অপেক্ষার পালা গলাবদ্ধ করে দিয়েছে। গলায় নল দিয়ে তরল খাবার দেওয়া হচ্ছে। শ্বাস নিশ্বাস নিতে পারছেন না। নাকের ভিতর দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। জামি বলল, নবী ভাই যদি আসতে চান তবে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। মা কথা বলতে পারছেন না। কাগজে লিখে অভিপ্রায় জানাচ্ছে।

আমি এটা আশা করি নাই। ক্যান্সার এত দ্রুত সারা গলায় ছড়িয়েছে অপারেশন করার বাইরে চলে গেছে। তার উপর কথা বলতে পারছেন না। এ অবস্থা জামী এবং খালাম্মা দুজনেই কাছেই বেদনাদায়ক।

আমি ভয়ে ভয়ে জামীকে জিজ্ঞেস করলাম, খালাম্মা কি তোমাকে কিছু বলেছে কোথায় উনার কবর দিতে হবে। আমি আরও বললাম এমনিতেই জিজ্ঞেস করলাম। অনেকে তো তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে। তাই ভাবলাম খালাম্মা কি রুমী বা তোমার বাবার কবরের পাশে কবর দিতে বলেছে। এত কথা বললাম এই জন্যে যে আমাকে খালাম্মা যা বলেছে, জামীকে কি তাই বলেছে।

জামী খুব সাধারণভাবে বলল। হা মা আমাকে বলেছে আমি যেন মাকে এখানে কবর দেই। বাংলাদেশে পাঠানোর কোনো দরকার নেই। আমেরিকাতে জামীর কাছে কবর হলে জামী কবরে দোওয়া দুরূদ পড়তে পারবে। আমি তাই ঠিক করেছি। যখন সে সময় আসবে, মার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আমার কাছে এখানে কবর দিব। তাছাড়া বাংলাদেশে লাশ পাঠানের ঝামেলা পোহাতে হবে না। এ ছাড়া, বাংলাদেশে তো আমাদের কেউ নেই। কে মার কবরে দোওয়া দরূদ পড়বে?

আমি জামীর কথাগুলো শুনলাম। ভাবলাম আজ যাক। আগামীকাল জামীকে আবার ফোন করে আমি এ বিষয়ে কথা বলব।

পরের দিন আমি আবার জামীকে ফোন করলাম। জামী, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন। খালাম্মার সাথে উনাকে কোথায় কবর দিতে হবে তা নিয়ে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। তোমাকে যা বলেছে, আমাকেও তাই বলেছে। উনার মরদেহ যেন বাংলাদেশে পাঠানো না হয়। জামী শোন। খালাম্মা এটা বলেছ, রাগ, দুঃখ ও অভিমান থেকে আমি জামীকে সব খুলে বললাম। উনার রাগের কথা শুনে জামী ও দুঃখ পেল। বলল, মার সাথে ওনার এমন কাজ করতে পারল? আমি বললাম, খালাম্মার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন মাত্র দুএজন। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ এবং লক্ষ লক্ষ কর্মী খালাম্মাকে শ্রদ্ধা করে। ভালোবাসে। জাহানারা ইমাম তাদের কাছে সংগ্রামের প্রতীক, সত্যের প্রতীক এবং ভবিষ্যতে সামনে এগোয়ে যাওয়ার প্রেরণা। ওনাকে বাংলাদেশে দাফন করতে হবে। উনার কবর হবে প্রেরণার উৎসস্থল।

জামী আমার কথা গুলো শুনল। জিজ্ঞেস করল, মা কি বলেছে আপনাকে। জানালাম, প্রথমে আমার কথা শুনতে চায় নাই। পরে চুপচাপ শুনেছেন কিন্তু রাগ করেন নাই। আমি সেটাকে মৌনং সম্মতি ভেবেছি। আল্লাহ না করুক, যদি সেই সিদ্ধান্ত আমাদের কে নিতে হয়, অতিসত্বর তা হলে জীবিত অবস্থার উনার স্পষ্ট মতামত নিতে হবে কোথায় উনি চির বিশ্রামে শুতে চান। আমি বললাম আমরা কয়েকজন দুএকদিনের মধ্যে খালাম্মাকে দেখতে আসছি। তুমি ও সুযোগ পেলে খালাম্মাকে আমাদের অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলতে পার।

এদিকে জাহানারা ইমামের বাংলাদেশে তাঁর মরদেহ পাঠানোর আপত্তির কথা আমি জামী ছাড়া আর কারো সাথে শেয়ার করি নাই কারণ এটা নিয়ে একটি রাজনৈতিক ইসু হউক সেটা আমি চাই না। এ খবরটি একটি চাঞ্চল্যকর মিডিয়া ইসু হবে সেটা আমি নিশ্চিন্ত। কেন তিনি এ সিদ্ধান্ত নিলেন, কার জন্যে ইত্যাদি বিষয়ে সত্য অসত্য খবর ছাপানো হতে পারে। যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আন্দোলনের ক্ষতি হতে পারে। তাই এতদিন এ বিষয়টি জামী ছাড়াও কাউকে বলিনি। জাহানারা ইমাম ও হয়তো অন্য কাউকে বলেন নি।

জাহানারা ইমামের শারীরিক অবস্থার খবর আমি প্রতিনিয়ত আমাদের কমিটির সদস্য সচিব ফরাশত আলী ও যৌথ আহবায়ক কাজী জাকারিয়া ভাই এর সাথে শেয়ার করতাম। এ ছাড়াও সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই ওর সাথে যোগাযোগ ছিল।

ফরাশত ভাইকে বললাম, জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্য খারাপের দিকে যাচ্ছে। কথা বলতে পারছেন না। আমাদেরকে উনাকে দেখতে যেতে হবে। ফরাশত ভাই বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম। আমরা দুজনে ঠিক করলাম একটি গাড়িতে যে

কয়েকজন ধরে তাদেরকে নিয়ে ড্রাইভ করে মিশিগানে যাব। কাজী-জাকারিয়া ভাইকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি অসুস্থতার অপরাগতা জানালেন। প্রবাসী সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই আগেই বলেছিলেন তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমার স্ত্রী বকুল জাহানারা ইমামের ভক্ত। খালাম্মা ও বকুলকে খুব পছন্দ করেন। বকুল আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে। তা হলে আমরা হলাম চারজন। আর তিন জনকে নেওয়া যাবে। আমরা যাচ্ছি শুনে প্রবাসীতে কর্মরত বিশ্বজিত যেতে চাইল। বিশ্বজিতের কাছে থেকে শুনে আমাদের কমিটির তরুণ কর্মী আবু তালেবকে ও দিলিপ নাথ যেতে চাইল। শেষ মূহূর্তে ড. জাফর ইকবাল যেতে চাইল। এখন সমস্যা হলো এক গাড়িতে সাত জনের বেশি এত লম্বা পথ যাওয়া যাবে না। আমরা গমন ইচ্ছুক আট জন। গাড়িতে সাতজন একজনে বাদ দিতে হবে।

এ সমস্যার কথা শুনে বকুল স্বেচ্ছায় জানালো তাকে আমরা বাদ দিতে পারি। বকুলের না যাওয়ার আর একটি কারণ ছিল। বিশ্বজিত সাহা নূতন বিয়ে করেছে। ওর স্ত্রী নূতন আমেরিকাতে এসেছে। একা বাসায় থাকতে পারবে না। তাই বিশ্বজিৎ ওর স্ত্রী রুমা সাহাকে আমাদের বাড়িতে রাখতে চাচ্ছে । সব কিছু মিলিয়ে বকুল স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গী হতে চাইল না। বকুল এমন ভাবে এর আগেও অনেকবার স্বার্থত্যাগ করেছে।

ফরাশত আলী নিউ ইয়র্ক থেকে মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই, তালেব, বিশ্বজিত ও দিলীপকে নিয়ে নিউ জার্সিতে আমাদের বাসা এলেন। জাফর ইকবাল আমাদের বাসায় এল রাত প্রায় দশটার দিকে। মিশিগানের উদ্দেশ্যে আমরা ১৪ মে শুক্রবার রাতে গাড়িতে রওনা হলাম।

ফরাশত আলী গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই আমি পেছনের সিটে অন্যদের সাথে। আমাদের গাড়ি নিউ জার্সি পেরিয়ে পেনসেলভেনিয়ার অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করল। গাড়ি চলছে পোকোনোজ মাউন্টেনের পাদদেশে দিয়ে তৈয়বী রাস্তায়। পিছনে থেকে রিয়ার ভিউ মিরবে দেখলাম ফরাশত ভাই এর চেহারার ঘুম ঘুম ভাব। এ রাস্তার এক পাশে পাহাড় অন্য পাশে ৫০ থেকে ১০০ ফুট নিচু । একবার গাড়ি নিচে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। ফরাশত ভাইকে বললাম গাড়ি পাশে কোণ নিরাপদ জায়গায় থামান। এবার আমি কিছুক্ষণ চালাই। আমি ড্রাইভ করতে লাগলাম। আমি এ রাস্তায় দিনে ও রাতে অনেক বার গাড়ি চালিয়েছি। সারাদিন আমি বাসায় বিশ্রাম নিয়েছি, অফিসে যাইনি। ফরাশত ভাই হয়তো সারাদিন কাজ করেছেন। তাই একটু ক্লান্ত। আমি আর ফরাশত ভাই জেগে। আর সবাই ঘুমাচ্ছে। সারারাত গাড়ি চালিয়ে সকাল বেলায় আবার ফরাশত ভাইকে দিলাম ড্রাইভ করতে।

সকলের ঘুম ভাঙ্গলে রাস্তায় বিশ্রাম কেন্দ্রে থাকলাম গাড়ীতে তেল নেওয়া হলো। প্রাতরাশ ও সেরে নিলাম। সারা সকাল গাড়ী চালিয়ে দুপুরে মিসিগান অঙ্গ

রাজ্যের ডেট্রয়েট এর পাশে ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ড শহরে পৌছালাম। জামী আগেই আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিল সে শহরে তাদের এক পারিবারিক বন্ধু ডাক্তার শামসুল হক এর বাসায়। আমরা সরাসরি ডাক্তার হক এর বাসায় গিয়ে উঠলাম। তিনি জামীর অনেকটা স্থানীয় অভিভাবকের মতো। বাংলাদেশি ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী একজন আমেরিকান। তারা দুজনে আমাদের সবার আদর যত্ন করতে সব রকমের ব্যবস্থা করলেন। আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে সরাসরি জাহানারা ইমামকে দেখতে সাইনাই হাসপাতালে উপস্থিত হলাম। জামী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

শেষ দেখা

জামী আমাদেরকে জানাল জানারা ইমামের নাজুক শারীরিক অবস্থার কারণে আমরা খুব স্বল্পক্ষণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব। তবে সবাই এক সাথে নয়। মাত্র দুজন দুজন করে পর্যায়ক্রমে ওনার কক্ষে প্রবেশ করতে পারব।

সে মোতাবেক আমিও মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই সর্বপ্রথমে উনার কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমরা ছালাম দিলাম। দেখতে পেলাম ধবধবে সাদা চাদর পরে বেডের উপর তিনি বসে আছেন। তিনি ছিলেন শান্ত-সৌম্য, মুখে ছিল স্মিত হাসি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। ইশারার অমাদেরকে বসতে বললেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, খালাম্মা এখন কেমন আছেন? তিনি কাগজে লিখলেন Still Fighting (আমি এখনো সংগ্রাম করে চলেছি।) আমাদের উভয় কে বিচলিত দেখে তিনি বললেন 'ভেঙ্গে পড়ো না, হাসো'।

আমরা উনার এ রকম অবস্থার দেখার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক চেষ্টা করেও উনার মতো স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। তিনি লিখে প্রশ্ন করলেন, দেশের অবস্থা কি? আন্দোলন কেমন চলছে ইত্যাদি।

আমরা বললাম, আপনিও নিয়ে চিন্তা করবেন না। দেশবাসী এবং প্রবাসীরা আপনার জন্যে দেয়া করছে। আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, উনার অবর্তমানে কি আন্দোলন চলবে? বাংলাদেশ কি যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকার মুক্ত হবে কোন দিন? আমরা ওনাকে উৎসাহিত করার জন্যে হ্যাঁ সুচক জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি একপর্যায়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বকুলকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন? ওর সাথে শেষ দেখা হতো। আমি কি উত্তর দিব বুঝতে পারলাম না। বললাম। খালাম্মা, বুকল ও আমি আবার আসব আপনাকে দেখতে।

এই সুযোগ আমি সেই পুরনো কথাটা উঠালাম। উনার মরদেহ আমরা

শেষ দেখা

জামী আমাদেরকে জানাল জানারা ইমামের নাজুক শারীরিক অবস্থার কারণে আমরা খুব স্বল্পক্ষণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব। তবে সবাই এক সাথে নয়। মাত্র দুজন দুজন করে পর্যায়ক্রমে ওনার কক্ষে প্রবেশ করতে পারব।

সে মোতাবেক আমিও মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই সর্বপ্রথমে উনার কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমরা ছালাম দিলাম। দেখতে পেলাম ধবধবে সাদা চাদর পরে বেডের উপর তিনি বসে আছেন। তিনি ছিলেন শান্ত-সৌম্য, মুখে ছিল স্মিত হাসি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। ইশারার অমাদেরকে বসতে বললেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, খালাম্মা এখন কেমন আছেন? তিনি কাগজে লিখলেন Still Fighting (আমি এখনো সংগ্রাম করে চলেছি।) আমাদের উভয় কে বিচলিত দেখে তিনি বললেন 'ভেঙ্গে পড়ো না, হাসো'।

আমরা উনার এ রকম অবস্থার দেখার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। অনেক চেষ্টা করেও উনার মতো স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। তিনি লিখে প্রশ্ন করলেন, দেশের অবস্থা কি? আন্দোলন কেমন চলছে ইত্যাদি।

আমরা বললাম, আপনিও নিয়ে চিন্তা করবেন না। দেশবাসী এবং প্রবাসীরা আপনার জন্যে দেয়া করছে। আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, উনার অবর্তমানে কি আন্দোলন চলবে? বাংলাদেশ কি যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকার মুক্ত হবে কোন দিন? আমরা ওনাকে উৎসাহিত করার জন্যে হ্যাঁ সুচক জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি একপর্যায়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বকুলকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন? ওর সাথে শেষ দেখা হতো। আমি কি উত্তর দিব বুঝতে পারলাম না। বললাম। খালাম্মা, বুকল ও আমি আবার আসব আপনাকে দেখতে।

এই সুযোগ আমি সেই পুরনো কথাটা উঠালাম। উনার মরদেহ আমরা

বাংলাদেশে পাঠাতে চাই। উনার অনুমতি চাইলাম। উনি লিখে জিজ্ঞেস করলেন, জামী-কি বলে। আমি বললাম, জামীর সাথে কথা হয়েছে। ওর আপত্তি নেই। জাহানারা ইমাম এবার লিখলেন, তোমরা যেটা ভাল মনে কর তাই করো।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আল্লাহকে মনে মনে শুকরিয়া জানালাম। এটাকে নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। আর এ বিষয়ে কথা বলাও খুব অসঙ্গতিকর। একটি জটিল সমস্যার এই ভাবে নীরবে সমাদান হল।

এবার মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই উনাকে বললেন, আমাদের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে আপনার কোন নির্দেশ বা বাণী আছে কিনা। উত্তরে জাহানারা তাৎক্ষণিক ভাবে লিখলেন। "এই আন্দোলন তো দেশবাসীকে নিয়েই। দেশবাসীর জন্যেই আমি অঙ্গীকার করেছিলাম আমৃত্যু আন্দোলনের রাজপথে থাকব। আমি এখনো আমার অঙ্গীকার পালন করে যাচ্ছি। এখন আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে-আমার অবর্তমানে আমি এ আন্দোলন দেশবাসীর-আপনাদের হাতে অর্পণ করলাম। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার পালন করবেন এবং সোনার বাংলাকে একাত্তরের ঘাতক দালালদের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। জয় আমাদের হবেই।

–সাইনাই হাসপাতাল, মিশিগান, ১৫ মে, ১৯৯৪"।

আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মুখ থেকে শ্লেষা পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডলে কোন কষ্টের ছাপ ছিল না। সাইনাই হাসপাতালে সে কক্ষের বাতাস ইতিমধ্যেই অনেক ভারী হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে ভারী বাতাস হালকা করতে পারছিলাম না। সেই অস্বস্তি কর পরিস্থিতিতে বিদায় নেওয়ার পালা। কি বলে বিদায় নেব। বুঝতে পারছিলাম এই হয়তো শেষ বিদায়।

অনেক কষ্টে জোর করে ধরে রাখা সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি আর টিকল না। আবেগের বাধ ভেঙ্গে গেল। অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করলাম। পারলাম না। দু চোখে অশ্রুর প্লাবন। জাহানারা ইমাম ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে, দু চোখে অশ্রুর ধারা টল টল করে গাল দিয়ে বেয়ে পড়ছে। আমরা টিসু পেপার আগিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে তিনি চোখ মুচ্ছেন। জামী এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে রুম থেকে আস্তে করে বেরিয়ে গেল।

বার বার উনার শুভ কামনা করে বিদায় নিলাম। উনি হাত নেড়ে বিদায় জানালেন।

ফারাশত আলী। জাফর ইকবাল ও অন্যান্যদের সাথে একই দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিদায় শেষে আমরা সাত জনই একই লিফটে নিচে নামলাম। আমরা নেমেই সবাই আলাদা হয়ে গেলাম। অন্যদের চক্ষুর আড়ালে প্রাণ খুলে কাঁদতে লাগলাম। আমরা সবাই কেউ হাসপাতালের বারান্দায়, কেউ পার্কিং লটে পায়চারী

করছিলাম এবং অশ্রু বিসর্জন দিয়ে বুক হালকা করছিলাম।

ইতিমধ্যে জামী নীচে এসেছে আমাদের সবাইকে বিদায় জানাতে। আমি জামীকে জানালাম, খালাম্মা অনুমতি দিয়েছেন। তুমি এবং আমি যেখানে ভাল মনে করি সেখানেই উনার মরদেহ কবর দিতে পারব। আমি আগেই ফোনে জামীর সাথে কথা বলেছিলাম যুক্তরাষ্ট্র সমন্বয় কমিটির খালাম্মার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

জামীকে আমাদের সমবেদনা জানিয়ে বিদায় নিলাম। খালাম্মাকে দেখতে আসার জন্যে জামী আমাদেরকে আবার ও ধন্যবাদ জানাল।

গাড়িতে সবাইকে জানালাম, জাহানারা ইমাম আমাকে মানা করেছিলেন বাংলাদেশে তাঁর মরদেহ না পাঠাতে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে জামীর কাছে আমেরিকার কবর দিতে। কিন্তু তিনি এখন রাজী হয়েছেন। বাংলাদেশ উনাকে কবর দিতে। কেন আপত্তি করেছিলেন, সেটা কেউ জানতে চাইল না। সবাই হয়তো ভেবেছিল, ছেলের কাছে আমেরিকার চিরশায়িত হতে। কিন্তু আপত্তির কারণ যে ছিল একটি রাজনৈতিক ঘটনা। তা আমি উল্লেখ করলাম না। চেপে গেলাম।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিউ জার্সি ফিরছিলাম। থমথমে ভাব গাড়িতে। ভাবছিলাম জাহানারা ইমাম কি দিয়ে তৈয়ারী। একজন মানুষ কি ভাবে মৃত্যুর মুখে এত স্বাভাবিক থাকতে পারেন। অন্যদেরকে হাসতে বলে। তিনি সত্যি এক অসাধারণ ব্যক্তি। ইস্পাত কঠিন মনের মানুষ।

ফরাশত আলী ও আমি পর্যায়কমে ১২ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে আমরা নিউ জার্সিতে ফিরে এলাম। মিশিগানে থেকে ফিরে আমরা জাহানারা ইমামের রোগমুক্তি কামনায় ও তাঁর স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থার জানানোর জন্যে এক সভার আয়োজন করি। ২২ শে মে রবিবার ম্যানহাটানের স্পেলম্যান সেন্টারেও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করি এবং ফরাশত আলী সভা পরিচালনা করেন। মোনাজাত পর্ব সম্পন্ন করেন মদিনা মসজিদের ইমাম মওলানা মুফতি আছাদুল হামিদ।

সে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির অন্যতম নেতা বাসদের সভাপতি খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া।

খালেকুজ্জামান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অনৈক্য বিভেদ দুর্বলতা ও ভুল ভ্রান্তির কারণে জামাত শিবির সহ স্বাধীনতা বিরোধীরা শক্তি সঞ্চয় করতে সুযোগ পেয়েছে। অথচ স্বাধীনতা পক্ষের শক্তিগুলো ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারলে জামাত-শিবির ঘর ছাড়া হতে বাধ্য হতো।

সভায় আমরা জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি সবাইকে অবগত করি এবং মিশিগানে সাইনাই হাসপাতালে আমাদের সাক্ষাতের বিবরণ

জানাই।

সভার এক প্রস্তাবে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের রোগ মুক্তির জন্য সকল উপসনালয়ে প্রার্থনা করার জন্যে সর্বস্তরের জনগণকে আহ্বান জানানো হয়। জাহানারা ইমাম কয়েকদিন পর আর একটি পূর্ণ বাণী-দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় জাহানারা ইমামের শেষ উচ্চারণ শীর্ষক এই বাণীটি ছিল দেশবাসীর প্রতি তার আহ্বান ও নির্দেশ।

এ বাণীটি আমাদের হাতে আসে। আমরা এটিও দেশে বিদেশে প্রচার করেছিলাম। নিম্নে বাণীটি পাঠকদের অবগতির জন্যে দেওয়া হল।

মৃত্যুশয্যায় জাহানারা ইমামের শেষ উচ্চারণ
দেশবাসীর প্রতি আমার আহ্বান ও নির্দেশ
সহযোদ্ধা দেশবাসীগণ

আপনারা গত তিন বছর ধরে একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ স্বাধীনতাবিরোধী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। এই লড়াইয়ে আপনারা দেশবাসী অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আন্দোলনের শুরুতে আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের অঙ্গীকার ছিল লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ রাজপথে ছেড়ে যাবো না। মরণব্যাধি ক্যান্সার আমাকে শেষ মরণ কামড় দিয়েছে। আমি আমার অঙ্গীকার রেখেছি। রাজপথ ছেড়ে যাই নি। মৃত্যুর পথে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং অঙ্গীকার পালনের কথা আরেকবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণ করবেন। আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে থাকবেন। আমি না থাকলেও আপনারা আমার সন্তান-সন্ততিরা-আপনাদের উত্তরসূরিরা সোনার বাংলায় থাকবেন।

এই আন্দোলনকে এখনো অনেক দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র ও যুব শক্তি, নারী সমাজসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই লড়াইয়ে আছে। তবু আমি জানি জনগণের মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নয়। জনগণই সকল শক্তির উৎস। তাই একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীর বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালার নির্মূল সমন্বয় আন্দোলনের দায়িত্বভার আমি আপনাদের বাংলাদেশের জনগণের হাতে অর্পণ করলাম। জয় আমাদের হবেই।

জাহানারা ইমাম

আমরা মিশিগানে জাহানারা ইমামকে দেখতে গিয়েছিলাম, এ খবর বাংলাদেশে প্রচার হয়েছিল। আমি বাংলাদেশ, লন্ডন এবং ইউরোপ থেকে ফোন পেলাম, জাহানারা ইমামকে কেমন দেখে এলাম। সবাইকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। দুঃসংবাদের অপেক্ষায় থাকতে বললাম।

আমাদের কমিটির সবাইকে আমরা জানালাম, প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র সমন্বয় কমিটি জাহানারা ইমামের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠাবো। এর জন্যে ফান্ড তুলতে হবে। নিউ ইয়ার্কের বাইরে ওয়াশিংটন ডিসি এবং বোস্টনে আমাদের কমিটির নেতাদেরকেও এ ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতে বললাম। এদিকে জাহানারা ইমামের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে প্রতিদিন। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন এই সংগ্রামী নেতা। অন্যদিকে বাংলাদেশে জাহানারা ইমাম সহ অনেক সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। যুদ্ধাপরাধী এবং পাকিস্তানী পাসপোর্ট ধারী গোলাম আযমের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার মামলা চলছিল। ৩ মে ছিল জাহানারা ইমামের জন্মদিন। সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উনাকে শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন মিশিগানে। তার একটি কপি আমার কাছে ছিল। ভাগ্যক্রমে ৩ তারিখের পূর্বে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমার বাসায় এসেছিলাম। দেখলাম জন্মদিনের দিনটিতে উনার স্বাক্ষর নেই। উনি আমেরিকায় ছিলেন বলেই হয়তো। তিনি শুভ জন্মদিনের দিনটিতে স্বাক্ষর করলেন। আমি ও উনার সাথে যোগ দিলাম। জামীকে খালাম্মার জন্যে শুভ জন্মদিনের চিঠিটা পাঠালাম।

মাঝে মাঝে ফোন করে জামীর কাছ থেকে খালাম্মার শারীরিক অবস্থা। জানতে চাইতাম। কিন্তু ফোন করতে দ্বিধা করতাম। জিজ্ঞেস করতে হবে, খালাম্মা কেমন আছে। খালাম্মা যে ভাল নেই তা সেই ২২ এপ্রিলের অপারেশনের পরেই আমরা জানি। মুখের মধ্যে ক্যান্সারের দানা এত বেশী ছড়িয়েছে যে কোন চিকিৎসা ছাড়াই মুখ গহবর বন্ধ করে দেওয়া আছে। উনার অবস্থা চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। আমরা স্বচক্ষে তা দেখলাম।

তারপরও জামীকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে খালাম্মা কেমন আছেন। জামীকে এ প্রশ্ন করে তাকে অস্বস্তিকর মধ্যে ফেলে দেওয়া। তবু জানার চেষ্টা করতাম। জামীর একই উত্তর, মা ভাল নেই।

২২ শে জুনের পর জাহানারা ইমামের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে মোড় নেয়। খাবার বন্ধ, ঔষধও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ভাগ্যের পরিহাস সে দিন ২২ জুন রাজাকার যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম বাংলা দেশের নাগরিকত্ব ফিরে পেল। এ দুঃসংবাদটি না জেনে জাহানারা ইমাম জ্ঞান হারালেন।

চির বিদায়

এমতাবস্থায় দিন নয়, প্রহর গুনছিলাম কখন সেই দুঃসংবাদটি পাব। ২২ তারিখের পর জামীকে ফোন করা বন্ধ করে দিলাম।

২৬ জুন সকালে জামীর ফোন, নবী-ভাই, মা আর নেই। শুধু এইটুকু কথা। আর কিছু বলতে পারল না। আমি শুধু জানালাম, আমি প্রথম যে ফ্লাইটে টিকেট পাব, সেই ফ্লাইটে তোমার কাছে আসছি।

আবেগ সামলে নিয়ে ফরাশত ভাই ও মোহাম্মদ উল্লাহ ভাইকে ফোনে জাহানারা ইমামের মৃত্যু সংবাদ জানালাম। সবাইকে জানাতে বললাম।

ঢাকতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে দুঃসবাদটি জানালাম। বললাম, জাহানারা ইমামের মরদেহ যত দ্রুত ঢাকায় পাঠাব। তিনি বললেন, আমরা প্রস্তুত। আপনারা মরদেহ যত দ্রুত পারেন পাঠান। তারপর ফোন করলাম। আওয়ামী লীগ নেতা ও সমন্বয় কমিটির স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য আব্দুর রাজ্জাকে। রাজ্জাকক ভাই কে বললাম, আমরা উনার মরদেহ ঢাকায় পাঠাচ্ছি আপনারা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা করবেন। তিনি বললেন, তোমরা কোন চিন্তা কর না শুধু জানাবে কোন ফ্লাইটে মরদেহ আসবে। তিনি শেখ হাসিনাকে জানাতে বললেন। উত্তরে জানালাম, উনাকে আমি ইতিমধ্যে জানিয়েছি। রাজ্জাক ভাই আরও জানালেন সমন্বয় কমিটির নেতা সৈয়দ হাসান ইমাম এবং শাহরিয়ার কবীর আমেরিকার পথে হয়তো ওরা তখন লন্ডনে। ওদের দুজনকে আমেরিকা না গিয়ে দেশে ফিরে আসতে বল। আমি সৈয়দ হাসান ইমাম ও শাহরিয়ার কবীর কোথায় আছেন তা জানি না। অগত্যা লন্ডনে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীকে ফোন করলাম। জাহানারা ইমামের মৃতু সংবাদ জানালাম। আরও জানালাম রাজ্জাক ভাই এর হাসান ইমাম ও শাহরিয়ার কবীরের প্রতি নির্দেশ। তাদের কে দেশে ফিরে যেতে। গাফ্ফার ভাই জানালেন তিনি তাদের দুজনের খোজ জানেন, তক্ষুণি ওনাদের দুজনকে দেশে ফিরে যেতে বলবেন, জাহানারা ইমামের মরদেহ গ্রহণ করার জন্যে।

ফরাশত আলী ও আমি বিমানের টিকেট খুঁজতে লাগলাম। ভাগ্যক্রমে পরের দিন সন্ধের সময় মিশিগানের ডেট্রোয়েটের দুটে টিকেট পেলাম। কাজী জাকারিয়া ভাইকে আমাদের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি অসুস্থ থাকায় আমাদের সঙ্গী হতে পারলেন না।

প্লেইন রাতে ডেস্ট্রেয়েটে পৌছালাম। জামী আগেই জানিয়েছিল খালাম্মার ছেলে তুল্য শহীদুল্লাহখান বাদল ও তার স্ত্রী ডাক্তার লায়লা খান ডেট্রোয়েটে এসেছিল কয়েকদিন আগে খালাম্মাকে দেখতে। জামী ব্যস্ত থাকায় বিমানবন্দরে আসতে পারবে না। তার পরিবর্তে বাদল আমাদেরকে রিসিভ করবে। এয়ারপোর্টে বাদল এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ব্যাচের ছাত্র ছিলাম। আমি বায়ো কেমিস্ট্রিতে আর বাদল ছিল ফিজিকসে। প্রায় বিশ বছর দেখা নাই। আমাকের চিনতে পারবে কিনা ভাবছিলাম। দেখি যাত্রীদের বহিরাগমন পথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাদল। বোধ হয় জামী ভালো ভাবে আমার চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। আমাদেরকে দেখে বাদল বলল, নবী– আমি বাদল তোমাদেরকে নিতে এসেছি। ধন্যবাদ জানিয়ে ফরাশত আলীকে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

গাড়িতে বাদল জানালো আমরা সরাসরি জামীর বাসায় যাব। ওখানে ডিনার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে তার পর আগের বার যে ডাক্তারের বাসায় গিয়েছিলাম। তার বাসায় রাত কাটাব। আমরা হোটেলে থাকতে চাইলাম। বাদল জানালো, এটা জামীর সিদ্ধান্ত।

জামীদের বাসায় গিয়ে কি অবস্থা দেখব। অনুমান করতে পারলাম না। জামী আমাদের রিসিভ করল। দেখলাম শোক সামলে নিয়েছে। হয়তো গত মাসাবধি চোখের সামনে তাঁর মাকে দেখেছে কিভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

প্রথমেই ওর স্ত্রী ফ্রিদার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ফ্রিদা ইউরোপীয় মহিলা। গ্রীকের মেয়ে। খালাম্মার কাছে ফ্রিদার অনেক গল্প শুনেছি। জাহানারা ইমামের ক্যান্সারের সাথে বসবাস গ্রন্থে ফ্রিদার কথা লিখেছেন। বিদেশীনি হয়েও বাংলা সংস্কৃতি ভালোভাবে রপ্ত করেছেন। খালাম্মাকে মায়ের মত সেবা শুশ্রুষা করেছেন, প্রতিদিন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন খালাম্মা কি খাবার খেতে পারেন, কি ভালবাসেন তার সব ব্যবস্থা ফ্রিদা করত। আমাদের বাসায় অবস্থান কালে আমার স্ত্রী বকুল ও খালাম্মার খুব আদর যত্ন করেছিল। খালাম্মা বকুলকে ফ্রিদার সাথে তুলনা করে বলত, আমার দু বৌমা জানে কিভাবে আমার সেবা শুশ্রূষা করতে হয়।

জামী জানালো খালাম্মার মরদেহ ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে ফিউনারাল হোমে পাঠানো হয়েছে। সেখানে হিমাগারে রাখা হয়েছে। আগামী কাল এমবালমিং হবে।

এদিকে জাহানারা ইমামকে জামাতে ইসলামী ও ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা মুরতাদ ঘোষণা করেছে। পত্রিকার খবর বেরিয়েছে জাহানারা ইমামকে জানাজা পড়ানো যাবে না। নিউ ইয়র্কের একটি জামাতী গোষ্ঠী মিশিগানে প্রচার করেছে যে কোন মওলানা জাহানারা ইমামকে জানাজা পড়াবে না। এ খবর শুনে একটু বিচলিত হয়েছিলাম। ডেট্রোয়েটের আসার আগেই সে সমস্যার সমাধানে করেছি। ডেট্রোয়েটের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিছু ব্যক্তিকে আমি চিনতাম। তাদের অন্যতম কায়েস ভাইকে ফোন করলাম। সমস্যার কথা বললাম। তিনি জানালেন একজন ইমাম ও কিছু সমর্থক নিয়ে তিনি আসবেন জাহানারা ইমামকে জানাজা পড়াতে। জামীকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। আগেই বলেছিলাম এরকম একটি ব্যবস্থা করতে পারব। সে সময় শুধু নিশ্চিত করলাম। শুনে জামী-স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

জামীর কথা না বললেই নয়। ভাই ও বাবাকে হারিয়েছে। নিজে কিশোর বয়সে পাকিস্তানীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার উপর মার গত ১৩টি বছর ক্যান্সারের চিকিৎসা করেছে। মাকে দেখেছে চোখের সামনে ক্যান্সার কিভাবে তিলে তিলে তাঁকে গ্রাস করছে। দেখেছে মায়ের কষ্ট, দেখেছে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। দেখেছে মায়ের মৃত্যু যন্ত্রণা। তার পরও ঐ রকম একটি বিরূপ অবস্থা সামলাতে পিছ পা হয় নাই।

আমাদেরকে ডিনার খাওয়ালো । ফ্রিদা এত দুঃসময়ের মধ্যে আমাদের জন্যে রান্না করেছে। সে রাতে দেখা হল বাদলের স্ত্রী-ডাক্তার নায়লা জামানের সাথে। নায়লাকে দেখেছি তারেক মাসুদের মুক্তিরগান ভিডিওতে। ওয়াহিদুল হক ও বেনুর নেতৃত্বে নায়লাদের সাংস্কৃতিক দল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী শিবিরে গান গেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল কাজী নূরুজ্জামানের মেয়ে নায়লা। আগেই বলেছি বাদল এবং নায়লা ঢাকাতে খালাম্মার দেখভাল করতেন। পরিবারিক সম্পর্ক। জাহানারা ইমামের ছেলে ও মেয়ের মত বাদল ও নায়লা। ২০ বছর পর বাদলের সাথে দেখা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করলাম। বাদল খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। রাজনৈতিক রাশেদ খানের মেননের ছোট ভাই। বাদল বেছে নিয়েছিল ব্যবসা। ইতিমধ্যেই সে একজন সফল ব্যবসায়ী। জামী আমাদের নিয়ে গেল তাদের সেই পারিবারিক বন্ধু যার বাসায় কিছুদিন আগে আমরা এসেছিলাম। দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম। উনাদের বাড়ীটি লেকের ধারে। আমেরিকান গৃহকর্তী বাড়ীটি খুব গুছিয়ে পরিপাটি করে রেখেছেন। কথা হল পরেরদিন দুপুরে ফিউনারাল হোমে ডাক্তার সাহেব আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। সে রাতে কায়েস ভাইকে জানালাম আগামীকাল ফিউনারাল হোমে আসতে। তিনি বললেন, কোন চিন্তা করবেন না। আমরা ইমাম সাহেব কে নিয়ে যথাসময়ে হাজির হব।

আমরা দুপুরে ফিউনারাল হোমে উপস্থিত হলাম। বিশাল এক চত্বরে

ফিউনারাল হোমটি। নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি অঞ্চলে ফিউনারাল হোম এর আয়তন স্বল্প পরিসরে। খুব সম্ভব জায়গায় স্বল্পতা ও আকাশ চুম্বী জমির দামের জন্যে।

ইতিমধ্যেই জাহানারা ইমামের মরদেহ এমবালমিং করা হয়েছে। এমবালমিং হল মৃত দেহের পেট কেটে নাড়ীভুড়ি ও অন্যান্য সব অরগান বের করা হয় যাতে মরদেহ বেশি দিন রক্ষণ করা যায়। মিশরে মমী তৈয়ারী করতে এই পদ্ধতি চালু হয়েছিল। একটি সুন্দর কাসকেটে জাহানারা ইমামের মরদেহ রাখা হয়েছে। ফিউনারাল হোমের একটি কক্ষে দেখার জন্যে কাসকেটটি আনা হয়েছে।

বকুল আমাকে বাংলাদেশের একটি জাতীয় পতাকা দিয়েছিল। সেটা কাসকেটের উপর মেলে দিলাম। আমি ও ফরাশত আলী সামরিক কায়দার সেলুট জানালাম।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। কাসকেটের একপ্রান্ত উন্মুক্ত করা হল। জাহানারা ইমামের মুখমণ্ডল সুন্দর করে রাখা হয়েছে। তিনি যেন নিদ্রারত কিন্তু সেটা যে চিরনিদ্রা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

দর্শকবৃন্দ এক এক করে সারিবদ্ধ হয়ে ভাবগম্ভীর ভাবে খালাম্মার মুখমণ্ডল দেখছেন। কিছুক্ষণ মাথার কাছে দাড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। দর্শকদের মধ্যে ছিল মিশিগানে জামীর বাঙালি বন্ধু-বান্ধব, আমেরিকান সহকর্মী বন্ধুও বৃন্দ। এছাড়াও কায়েস ভাই সহ তার কয়েক জন বাঙালি সহচর। ইমাম সাহেব এবং আমরা মরদেহ পরিদর্শন শেষে ফিউনারাল হোমের একটি কক্ষে সবই সমবেত হলেন। এখানে জাহানারা ইমাম এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে। সবাই নীরবে চেয়ারে বসলেন।

জামী-তাঁর মায়ের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানালে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে। জাহানারা ইমামের অসুস্থতার সময়ে এবং চিকিৎসা কালীন দুঃসময়ে যারা সাহায্য ও সমবেদনা জানিয়েছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর মা যদি কাউকে কোন বিষয়ে দুঃখ দিয়ে থাকেন, তার জন্যে ক্ষমা চাইলেন এবং সবাইকে তাঁর মাকে ক্ষমা করতে অনুরোধ জানালেন।

সে অনুষ্ঠানে জাহানারা ইমামের উপর আমাকে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করা হল।

আমি ইংরেজীতে বক্তব্য রাখলাম। আমি বলতে শুরু করলাম।,আমরা একজন অসাধারণ ব্যক্তির শেষকৃত্যের জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি ছিলেন একাধারে মা, স্ত্রী, শিক্ষাবিদ, লেখক এবং সর্বোপরি একজন জননেতা। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজ ছেলে, স্বামীকে হারিয়েছেন। গত ১৩ বছর ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

এই বিদুষী মহিলা ১৯৯২ থেকে বাংলাদেশে একজন জননেত্রী হিসাবে

আর্ভিবুত হয়েছিলেন। তাঁর কোন সেনাবাহিনী ছিল না। পুলিশ বাহিনী ছিল না। তিনি কোন দলের নেতা ছিলেন না। কোন সরকারি পদে আসীন ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। তাঁকে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনুসরণ করত। কারণ, তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার চেয়েছিলেন। তাদের বিচারের দাবীতে গণআদালত করেছিলেন। এই মহান নেতার তিরোধানে বাংলাদেশ এক আর্দশিক ও ন্যায়বান নেতাকে হারালেন এক কথায় জাহানারা ইমাম ছিলেন এক মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী!

স্বরণসভা শেষে ফ্রিদা এবং বেশ কয়েকজন আমেরিকান আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, জাহানারা ইমামের জননেত্রীর ভূমিকা তাদের জানা ছিল না। ফ্রিদা আরও জানালো আমি মাকে আমাদের মা হিসাবে জানতাম। তিনি একজন সাধারণ মা হয়ে তোমাদের দেশের ইতিহাসে এ রকম ভূমিকা রেখেছেন তা আগে বুঝতে পারি নাই। স্মরণ সভাশেষে বাইরে জাহানারা ইমামের জানাজা পাড়নো হল। মওলানা সাহেব জাহানারা ইমামের আত্মাকে স্বর্গবাসী করার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আমরা সবাই ইমাম সাহেবের প্রার্থনা শেষে উচ্চ স্বরে আমিন বলে মোনাজাত শেষ করলাম।

আমেরিকাতে মরদেহ সৎকারের জন্যে ফিউনারাল হোমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কি কি সার্ভিস লাগবে সে বিষয়ে চুক্তি করতে হয়। একটি চেক লিখলেই চলে। তারা চুক্তির টাকার পরিমাণ মোতাবেক বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে থাকে। বিভিন্ন দামের কাসকেট পাওয়া যায়। ফিউনারাল হোম এ মরদেহ পরিদর্শনের পর খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খাবারে কি মেনু থাকবে, তা নির্ভর করে চুক্তির ফি এর উপর।

যাই হোক, জানাজা শেষে জামী সব অতিথিকে দুপুরের আহারের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। ফিউনারাল হোমে চত্বরে মূল অফিসের বিপরীত অংশে ডাইনিং হলে খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

জামী ইতিমধ্যে মরদেহ বাংলাদেশ পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। প্লেনের টিকেট ক্রয়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। মরদেহ বিদেশে পাঠাতে হলে গন্তব্য দেশের দূতাবাস বা কনসুলার অফিসের ছাড়পত্র লাগে। সে দিন পর্যন্ত কোনো কিছুই স্থির হয়নি। কিন্তু কাজ চলছিল। জামী জানাল টিকেট কেনা হলেই সে আমাকে মরদেহ কবে ঢাকাতে পৌছবে জানাবে ফরাশত আলী এবং আমি সে রাতে নিউইয়র্কে ফিরে এলাম। সে রাতেই বাংলাদেশে রাজ্জাক ভাইকে জানাজা হয়েছে বলে জানালাম। টিকেট কেনা হলে মরদেহ কখন ঢাকা পৌছবে তা জানাতে রাজ্জাক ভাই আমাকে বললেন।

লন্ডনে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীকে ফোনে আমাদের ডোট্টোয়েটের অভিজ্ঞতা জানালাম। জানাজা সম্পন্ন হয়েছে জেনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ইতি মধ্যেই

জামাতীরা দেশে বিদেশে অপপ্রচার চালিয়েছিল, আমেরিকার কোনো ইমাম বা মওলানা জাহানারা ইমামের জানাজা পড়াতে রাজী-হয় নাই। শত্রুর মুখে চুনকালি মেখে আমরা সবাইকে জানালাম, জাহানারার মরদেহ ঢাকা পৌঁছাবে।

গাফ্‌ফার ভাই জানালেন তিনি সৈয়দ হাসান ইমাম ও শাহরিয়ার কবীরকে রাজ্জাক ভাই এর নির্দেশ জানিয়েছেন। সে মোতাবেক সৈয়দ হাসান ইমাম আমেরিকা আসছেন না। তিনি লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরৎ যাচ্ছেন জাহানারা ইমামের মরদেহ গ্রহণ করার জন্যে। কিন্তু শাহরিয়ার কবীর আমেরিকা আসছেন জুনের ৩০ তারিখে। নিউ জার্সির নিউ ইয়র্ক এয়ার পোর্টে পৌঁছাবেন। গাফ্‌ফার ভাই আমাকে অনুরোধ জানালেন শাহরিয়ার কবীরকে এয়ার পোর্টে রিসিভ করতে এবং আমার বাসায় থাকার ব্যবস্থা করতে। আমি যখন জামীর সাথে খালাম্মার মরদেহ বাংলাদেশ পাঠানোর ব্যয়ভার বহনের প্রস্তাব দেই, জামী-তাতে সায় দেই নাই। জামী বলেছিল, নবী ভাই, আমি মার চিকিৎসার জন্যে এত খরচ করতে পেরেছি, মরদেহ বাংলাদেশের পাঠানোর খরচও বহন করতে পারব। আমি জামীকে বুঝিয়ে ছিলাম, সে কারণেই তোমার উপর আর অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে চাই না। খালাম্মা তো চেয়েছিলেন তাঁকে আমেরিকায় কবর দিতে সেটা হলে তো বাংলাদেশে মরদেহ পাঠানোর অতিরিক্ত খরচ তোমাকে করতে হত না। যেহেতু আমরা বাংলাদেশ মরদেহ পাঠাতে চাচ্ছি। আমাদেরকে এ দায়িত্বটুকু নিতে দাও। তা ছাড়াও আমাদের সমন্বয় কমিটির নেতা কর্মীরা এতে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত জামী আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল।

জাহানারা ইমামের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দকে অর্থসংগ্রহের অনুরোধ জানাই। তারা এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিলেন। আমরা মোট ৫,৬৩৫.০০ ডলার জামীকে পাঠাই। এর মধ্যে ওয়াশিংটন ডিসি এলাকা থেকে ৯৫০.০০ ডলার। বোস্টন এলাকা থেকে ৪০০.০০ ডলার এবং নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি এলাকা থেকে ৪,৬৮৫ ডলার সংগৃহিত হয়। স্বস্বচ্ছতার জন্যে ওয়াশিংটন ডিসি এলাকা থেকে ড. খোরশোদ আলম চৌধুরী এবং বোস্টন এলাকা থেকে ৬: বামন দাস বসুকে তাদের সংগৃহিত অর্থ সরাসরি জামীকে পাঠাতে বলি। নিউ ইয়র্ক এলাকা থেকে সংগৃহিত অর্থ ফরাশত আলী সরাসরি জামীকে পাঠান। আমার এবং বকুলের পক্ষ থেকে আমাদের অনুদান সরাসরি জামিকে পাঠাই। আমাদের পাঠানো মোট ৫,৬৩৫ ডলারের মধ্যে জাহানারা ইমামের মরদেহ বাংলাদেশের পাঠাতে মোট খরচ হয়েছিল ৪,৪৭.৭০ ডলার। উদ্বৃত্ত ৯৮৭.৩০ ডলারের জায়গায় জামী আমাকে একহাজার ডলার ফেরৎ পাঠায়।

জামীর আয় ব্যয়ের একটি বিস্তারিত হিসাব আমাকে পাঠায় যা এখনো আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। জাহানারা ইমাম ও আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছলতায় বিশ্বাস করতেন এবং তা মেনে চলতেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্র কমিটি থেকে এবং

অনেক সময় আমি ব্যক্তিগত ভাবে যে আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশের সমন্বয় কমিটির জন্যে পাঠাতাম, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্তি সংবাদ জানাতেন এবং পরে কোন খাতে তা ব্যয় হয়েছিল, তারও বিবরণ আমাকে পাঠাতেন।

জামীও মায়ের কাছে থেকে আর্থিক স্বচ্ছতার সে শিক্ষা পেয়েছে। একেই বলে উপযুক্ত মায়ের উপযুক্ত সন্তান!

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে বাংলাদেশের সমন্বয় কমিটির নুতন আহ্বায়ক কবি বেগম সুফিয়া কামালের কাজ থেকে আমাকে লেখা একটি চিঠি পাই। তিনি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি আর্থিক সংকটে আমরা কিছু সাহায্য পাঠাই। উত্তরে জামীর পাঠানো সেই উদৃত এক হাজার ডলার সৈয়দ হাসান ইমামের মাধ্যমে কবি সুফিয়া কামালকে পাঠাই।

শাহরিয়ার কবীরের লেখা ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখের চিঠিতে সে এক হাজার ডলারের প্রাপ্তি সংবাদ পাই।

পরের দিন জামী জানালেন জাহানারা ইমামের মরদেহ ঢাকা পৌঁছবে জুলাইয়ের চার তারিখে। জামী তাঁর মায়ের মরদেহের সঙ্গে একই বিমানে ঢাকা যাবে।

৪ জুলাই বিকেলে জাহানারা ইমামের মরদেহ বহনকারী বিমানটি ঢাকাতে অবতরণ করে। তাঁর কফিনটি গ্রহণ করেন কবি সুফিয়া কামাল, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, ঢাকা সিটির মেয়র হানিফ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ পরের দিন সকালে জাহানারা ইমামের কফিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হয় সর্ব স্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ। আবাল বৃদ্ধবণিতা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহীদ জননী জাহানারা ইমামের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফুলে ফুলে ভরে উঠে শহীদ মিনারের পাদদেশ। দুপুরে যোহরের নামাযের পর জাতীয় ঈদগাহ মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মরদেহ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী-ও মুক্তিযোদ্ধা কবরস্থানে চির নিদ্রায় সমাহিত করা হয়। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের আট জন সেক্টর কমান্ডার শহীদ জননীকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকারের দেওয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে চির বিদায় নিলেন। অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের গাড়িতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস!

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ত্যাগ বৃথা যায় নি। পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ম্যানডেট নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রাইম ট্রাইবুনাল গঠন করেন। যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাসির দাবীতে গণজাগরণ মঞ্চ গঠিত হয়।

শাহ্‌বাগ চত্বরে গণজাগরণ মঞ্চের সমাবেশে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের বিরাট আকারের প্রতিকৃতি শোভাপায়। এ দৃশ্য দেখে আমার ক্ষোভ হতাশা কিছুটা হলে লাঘব হয়েছে।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আত্মা সে দৃশ্য দেখে একটু হলে সান্তনা পেয়েছে। যুদ্ধপরাধের বিচার চলছে। ইতিমধ্যে শীর্ষ স্থানীয় যুদ্ধপরাধীদের অনেকের বিচার সম্পূর্ণ হয়েছে। অনেকে মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। দু একজন যাবৎ জীবন কারাদণ্ডের আদেশ পেয়েছে। একজন যুদ্ধপরাধীর ফাসির রায় কার্যকর হয়েছে। যে দিন বাংলাদেশের সকল যুদ্ধপরাধীদের বিচার শেষ হবে, যে দিন তারা সবাই শাস্তি পাবে যে দিন বাংলাদেশ রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধী মুক্ত হবে, সেই দিনই শুধু শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আত্মা শান্তি পাবে।

MRS. JAHANARA IMAM
KONIKA, 355 ELEPHANT ROAD, DHANMONDI, DHAKA-1205
PHONE - 507522

ঢাকা, ৩ জুন, ৯২

স্নেহের নূরুন নবী,

[illegible] আপনাদের [illegible]
আমেরিকার সাথীদের $ ২৬০০/- (দুহাজার ছয়শত) ডলারের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র পাঠাচ্ছি। তোমার [illegible] আমরা [illegible] পাইনি। [illegible]
[illegible] সুখবর।

[illegible] আমেরিকার
দুহাজার ছয়শত ডলার একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নামে চেক, জাতীয় সমন্বয় কমিটির নামে নয় — এই নিয়ে আমেরিকার প্রবাসে কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমি এখন কিছু কথা আপনাদের বলব। [illegible] (কিন্তু আমার এই চিঠি) [illegible] (কিংবা [illegible] চিঠি দেখাতে) পারেন।

— — — — — — — — — —

এই চিঠি [illegible] যে, কোনো [illegible] হয়।

[illegible] আপনাদের [illegible] ও কৃতজ্ঞতা [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] ভালো [illegible] না।

স্নেহ ও শুভেচ্ছা রইল —

আশীর্বাদিকা —
জাহানারা

P.S. U.C.B.L. [illegible]
[illegible]
[illegible]

পরিশিষ্ট-২

NATIONAL COORDINATING COMMITTEE FOR REALIZATION OF
BANGLADESH LIBERATION WAR IDEALS AND TRIAL OF BANGLADESH WAR CRIMINALS OF 1971
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি
35-36 Bangabondhu Avenue, Dhaka-1000. Phone : 325767, 328730, 401930

Dr. Nuran Nabi
58. Kinglet drive South
CRANBURY. NJ. 08512

বৈদেশিক শাখাসমূহের জন্য সার্কুলার—১

তারিখ ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং

প্রিয় সহযোদ্ধা,

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমাদের প্রাণপ্রিয় আহবায়ক শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর জাতীয় সমন্বয় কমিটি তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। গত আড়াই বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র শাখাসহ ইউরোপীয় দেশের শাখাসমূহ বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে জাতীয় সমন্বয় কমিটির একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী চলমান আন্দোলনকে বেগবান রেখেছিল। জাহানারা ইমাম অর্থ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর অবর্তমানে জাতীয় সমন্বয় কমিটির বৈদেশিক শাখাসমূহের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ ও নিয়মিত যোগাযোগ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন একাত্তরের ঘাতকদের দল জামাতে ইসলামী কিভাবে পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করছে। তাদের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য সম্বলিত পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার ও অডিও ক্যাসেট লক্ষ লক্ষ কপি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, যার বিপরীতে অর্থাভাবে আমাদের প্রচারসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে ব্যহত হচ্ছে।

বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ দফতর প্রতিষ্ঠাসহ জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে পরিচালনার জন্য মাসে কম পক্ষে ১ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে— বিশেষ করে বড় জনসভা অথবা পোস্টার-পুস্তিকা-ক্যাসেট ইত্যাদি ছাপতে গেলে এই অংক ২ লক্ষ অতিক্রম করতে পারে।

দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিত্তবান ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের অনেকে ইচ্ছা থাকলেও সরকারী ভয় ভীতির কারণে এখন আমাদের সঙ্গে সংশ্রব রাখাটা বিপদজনক মনে করেন। এমতাবস্থায় জাতীয় সমন্বয় কমিটির আর্থিক সমস্যা নিরসনের জন্য আমাদের বৈদেশিক শাখাসমূহের নিয়মিত সাহায্য গুরুতর প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই সার্কুলার পাওয়ার পরই আপনারা জরুরী কর্মীসভা আহবান করবেন এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে কেন্দ্রে আপনাদের প্রতিশ্রুত অঙ্কের চাঁদা পাঠাবেন।

আমাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট আগের মতোই রয়েছে। ব্যাঙ্কার—ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এলিফ্যান্ট রোড শাখা। ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ প্রাপকের সম্পূর্ণ নাম লিখবেন— *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয়কমিটি।*

আপনাদের কর্মীসভার পরপরই চিঠি দিয়ে জানাবেন প্রতি মাসে কত টাকা আপনারা পাঠাবেন। এতদ্‌সঙ্গে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ ও মতামত আহবান করছি।

আপনাদের কুশল ও সাফল্য কামনা করি।

সুফিয়া কামাল

(সুফিয়া কামাল)
আহবায়ক

বিশ বছর গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে ডান থেকে জাস্টিস কে এম সোবহান, কবি শামসুর রাহমান, লেখক, সাংবাদিক হারুণ হাবীব ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

বিশ বছর গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে দর্শক সারিতে সভাকক্ষের ডানপার্শ্বে জাহানারা ইমাম, অধ্যাপক সানজীদা খাতুন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

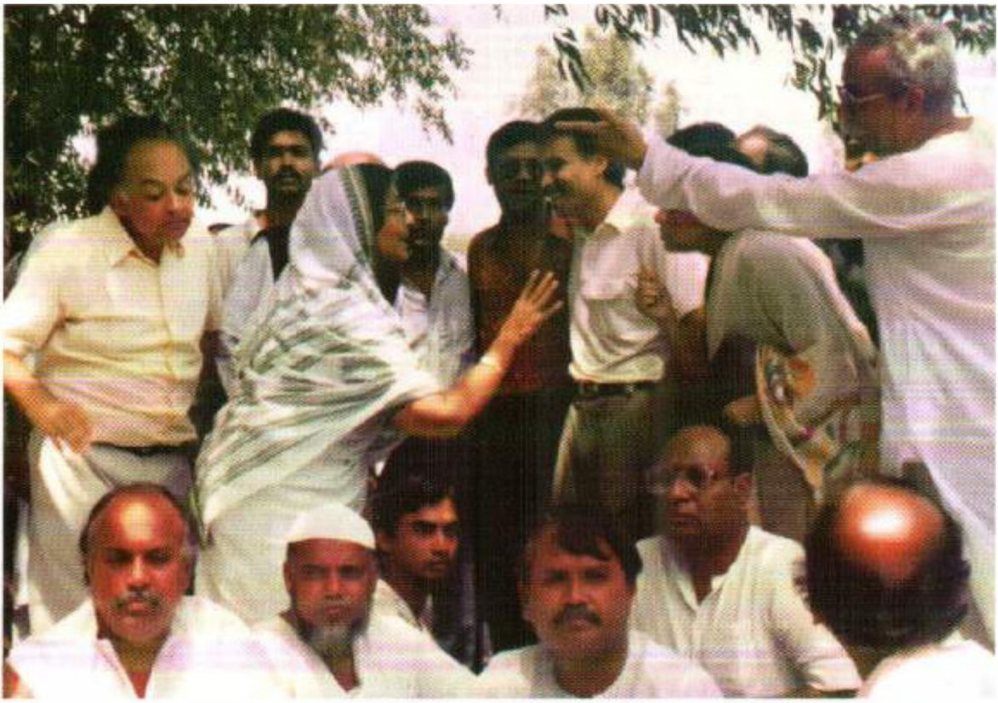

২৬ মার্চ, ১৯৯২, গণআদালত শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

জনসভায় বক্তৃতারত শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

মহাসমাবেশের মঞ্চে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৩, নিউওয়ার্ক বিমানবন্দরে ডান থেকে ফরাশত আলী, লেখক, ড. জিনাত নবী, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, কাজী জাকারিয়া, তালেব ও কওসার

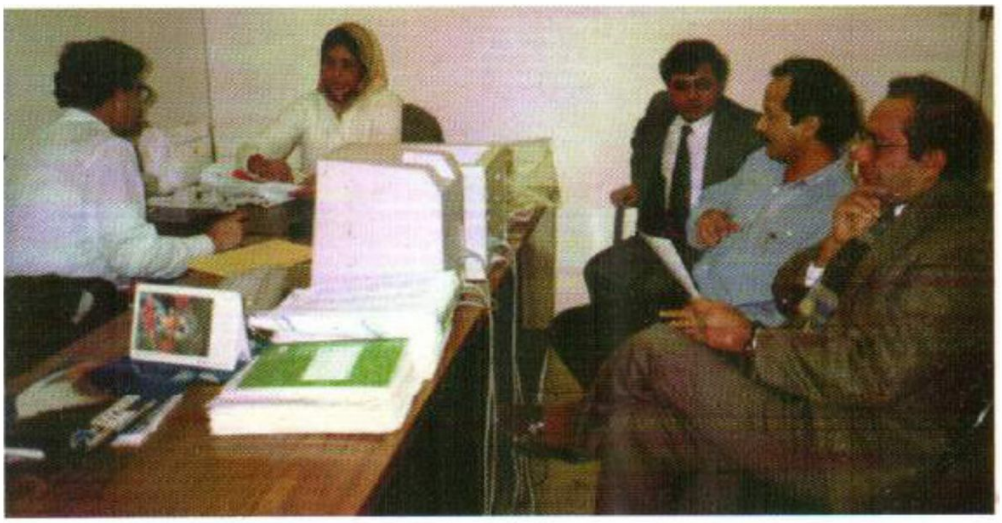

নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে সাপ্তাহিক প্রবাসী অফিসে, ডান থেকে ড. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ড. মুশতাক এলাহী, লেখক, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ

নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলনে ডান থেকে কাজী জাকারিয়া, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও লেখক

নিউ ইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলনে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। ডান থেকে কাজী জাকারিয়া, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, লেখক, ফরাশত আলী এবং সাংবাদিকবৃন্দ

ওয়াশিংটন ডিসিতে ডান থেকে ড. জিনাত নবী, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও লেখক

নিউ ইয়র্কে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নৈশ ভোজে ডান থেকে হাসানুল হক ইনু, লেখক, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তৎকালীন জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, কাজী জাকারিয়া ও নূরুল ইসলাম অনু